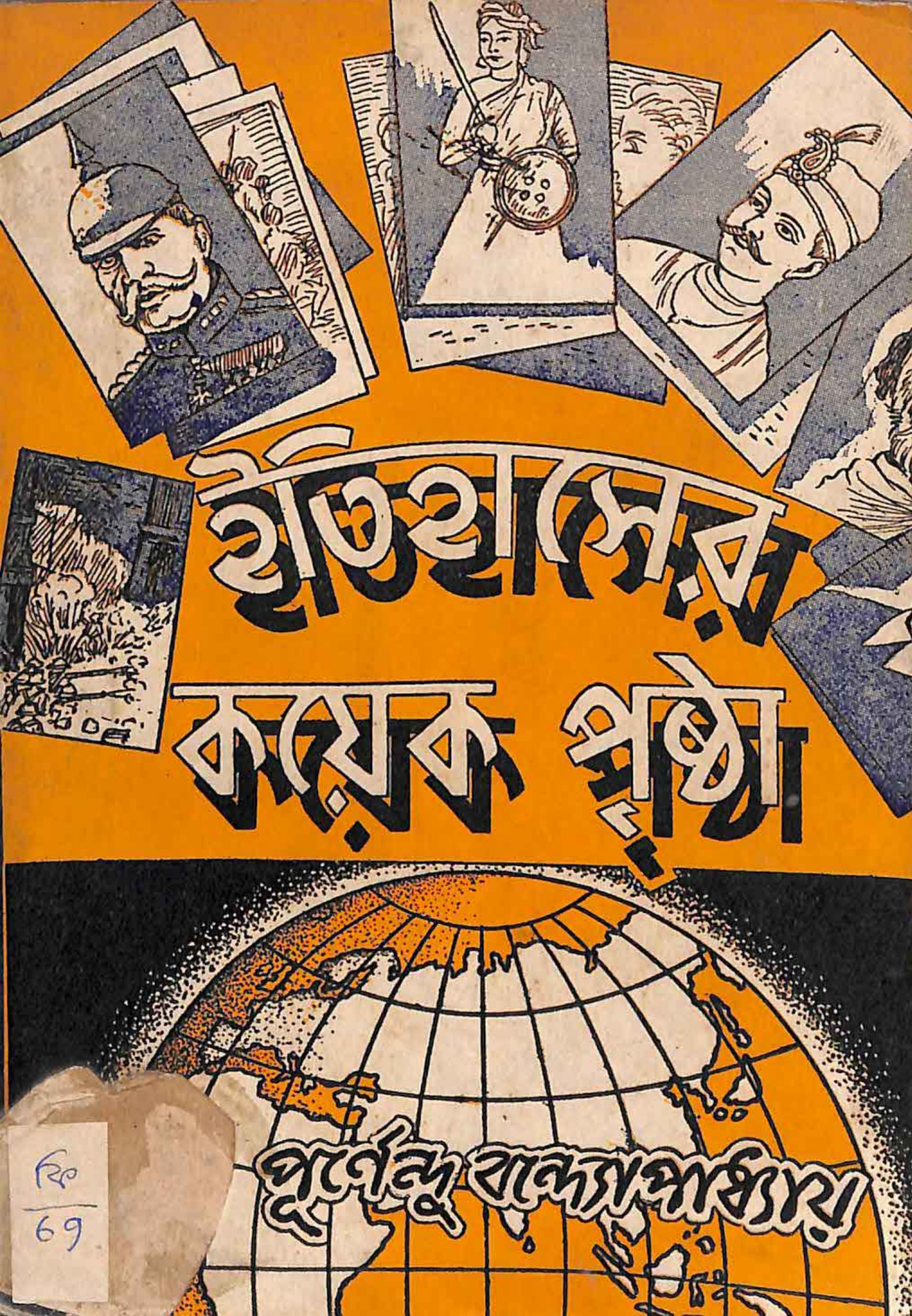
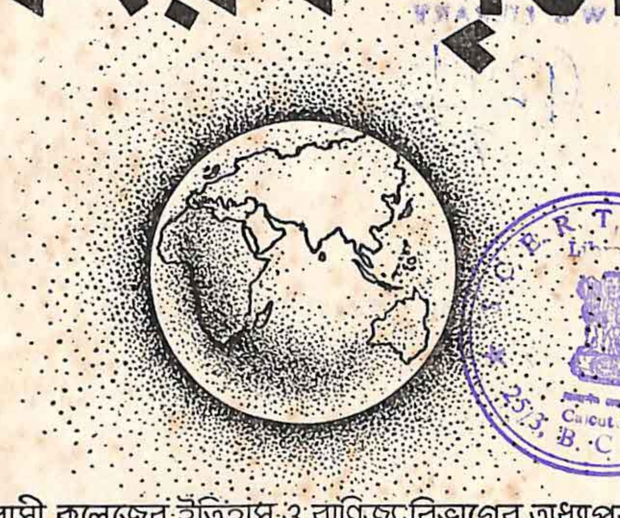


ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা

পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা



বঙ্গবাসী কলেজের ইতিহাস ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক,
বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের অধ্যাপক ও সিনেটের সদস্য

পূর্ণেন্দুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এম.এ., বি.এল., ডি.এসপি.ই.

সিটি বুক কোম্পানী
১৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট :: কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ সাল
দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৪৯ সাল

দাম এক টাকা বারো আনা

প্রকাশক—শ্রীক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
দি সিটি বুক কোম্পানী, ১৫, বংকিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—ফণিভূষণ রায়, প্রবতক প্রিণ্টিং এণ্ড হাফটোন লিঃ
৫২।৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টুট্‌সিকে
তার জন্মদিনে
২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮

নিবেদন

এই পুস্তকের ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি ১৯৩৪—১৯৪৮ সালের মধ্যে লেখা। এদের কতকগুলি নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল এবং তারকা-চিহ্নিতগুলি ভারতীয় বেতার-কেন্দ্র হ'তে প্রচারিত হ'য়েছিল। কতিপয় সুধীবন্ধুর অনুরোধে এই ক্ষুদ্রগ্রন্থ প্রকাশিত হ'ল।

অনুসন্ধিৎসু কিশোর-মনে এই কাহিনীগুলো যদি বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পাঠের স্পৃহা জাগায়, তা হ'লে এই পুস্তক-রচনা ও প্রকাশ সার্থক হ'বে।

সূচীপত্র

* কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র হ'তে প্রচারিত।



অশোক

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ ক'রলেন। অশোকের পিতা বিন্দুসার ও পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের শৌর্যবীর্য ও বিচক্ষণতার ফলে তখন ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। ভারতে তখন বহিঃশত্রুর বিশেষ ক'রে গ্রীক আক্রমণের ভয় আর ছিল না।

সম্রাট্ অশোক প্রথম জীবনে তাঁর পূর্বপুরুষদের মতই রাজ্যলিপ্সু ছিলেন। তাঁর অভিষেকের বারো বছর পরে তিনি কলিঙ্গদেশ

বর্তমান উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। যুদ্ধে অশোক জয়ী হলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের শোচনীয় দৃশ্য তাঁকে বিচলিত ও ব্যথিত করে তুল্‌ল। তিনি সংকল্প করলেন যে, পশুবলের দ্বারা দিগ্বিজয় বা রাষ্ট্র-প্রসার তিনি আর ক'রবেন না—অহিংসার পথে ধর্মাভিযান করেই সহস্র সহস্র নরনারীর হৃদয় জয় করবেন। তিনি এই সময় বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হ'লেন এবং ভগবান বুদ্ধের মৈত্রা, অহিংসা ও ক্ষমার মন্ত্র তাঁকে এক নতুন আর মহান পথের সন্ধান দিল। তাঁ'র জীবনের ব্রত হ'ল, শান্তি, মৈত্রী আর সেবার বাণী দেশে ও বিদেশে প্রচার করা। দেশে ধর্মমহামাত্র নামে এক শ্রেণীর নতুন রাজকর্মচারী নিযুক্ত হ'ল গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ধর্মনীতি প্রচার করবার জন্যে। রাজ্যের বহু স্থানে পর্বতগাত্রে আর প্রস্তরস্তম্ভে ধর্মলিপি উৎকীর্ণ ক'রে দেওয়া হ'ল।

এই শিলালিপিগুলি অতি সহজ ও সরল ভাষায় অশোকের বাণী প্রচার ক'রল। "মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও, সদয় ব্যবহার কর, জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর হ'য়ো না, অসত্য বা অধর্মকে প্রশ্রয় দিওনা"—এই হ'ল অশোকের সহজ সরল উপদেশ। বিদেশে তিনি পাঠালেন মৈত্রীদূত আর প্রচারক মণ্ডলী। প্রচারকমণ্ডলী অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার ক'রে সজীব ক'রে তুল্‌ল নানা দেশ—যেমন, চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র, ব্রহ্মদেশ। অশোকের মৈত্রী-দূতেরা দূর-দূরান্তরে সিরিয়া, গ্রীকরাজ্য আন্তিয়োকস্‌, থীয়স্‌, মিশরের গ্রীক নরপতি

টলেমী ফিলাডেলফস্, ম্যাসিদনের রাজা আন্তিগোনাস্ গোনতস্, এপিরাসের রাজা আলেকজাণ্ডার আর উত্তর-আফ্রিকার সিরিনের অধিপতি ম্যাগাস-এর দরবারে বিশ্বমৈত্রী ও জন-কল্যাণের বাণী পৌঁছে দিল। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা ধর্মবিজয়ের জয়পতাকা বহন করে নিয়ে গেলেন তাম্রপর্ণী বা সিংহলে। ভারতের সঙ্গে সভ্য জাতিপুঞ্জের এক পরম বন্ধুত্বের ও সৌজন্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল।

অশোক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মতই জীবন যাপন করতেন। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়ে যোগ দান করেন। কিন্তু কখনও অপর ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধাবান হ'ন নি। সকল ধর্মের ও সভ্যতার সারতত্ত্ব তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রত; তাই বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু, একথা মনে রাখা প্রয়োজন, তাঁর এই মৈত্রী-ধর্মের সঙ্গে রাজধর্মের কোনো বিরোধ ছিল না। দেশ-শাসন, দুষ্কৃতির দমন, বৈরনির্যাতন, ন্যায় ও কীর্তি অনুযায়ী প্রজাপালন, এসব বিষয়ে অশোক কখনও শৈথিল্য দেখান নি। শত্রুর দলন যে রাজধর্মের অন্যতম অঙ্গ, তা তিনি একাধিকবার নানা লিপিতে বলেছেন। কেউ যদি তাঁর রাজ্যের ও প্রজাদের আক্রমণ করে, তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, অস্ত্রধারণ ক'রেও আক্রমণকারীদের শাস্তি দিতে তিনি কুণ্ঠিত হ'বেন না। গুরু অপরাধে প্রাণদণ্ড দিতেও তিনি ইতস্তত করেন নি। বধদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের তিনি সময় ও সুযোগ দিতেন, যাতে তারা প্রাণদণ্ডের পূর্বে, দান, উপবাস, উপাসনা প্রভৃতি

ধর্মাচারণের দ্বারা নিজেদের পারত্রিক মঙ্গল অর্জন করতে পারে ও প্রজাসাধারণের মধ্যে ধর্মপরায়ণতার প্রেরণা অক্ষুণ্ণ থাকে।

অশোকের বিশাল রাজ্যের শাসনপদ্ধতি সুসঙ্গত ও সুশৃংখল ছিল। শাসক হিসেবে তিনি তাঁর পিতা-পিতামহের যোগ্য বংশধর ছিলেন। প্রজাপালন তাঁর শাসনের প্রধান অঙ্গ ছিল। তাঁর আদেশ ছিল যে, যখনই বিশেষ প্রয়োজন থাক্‌বে, রাত্রে বা দিনে যে কোনো সময়ই তাঁকে যেন সংবাদ দেওয়া হয়। নানা শ্রেণীর রাজকর্মচারীরা তাঁকে রাজ্যশাসনে সাহায্য ক'রতেন, যেমন, রাজকুমার মহাপাত্র, ধর্মমহামাত্র, রাজুক, প্রতিবেদক। সকল রাজকর্মচারীরা তাঁর অধীনে শান্ত, সংযত ও মানবজীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জনসেবার জন্যে তাঁর নির্দেশমত রাজকর্মচারীরা পথঘাট, বিশ্রামাগার, আরোগ্যশালা প্রভৃতি নির্মাণ ও পর্যবেক্ষণ করতেন। দেশে অনেক নূতন রাস্তা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, ছায়া-বহুল বৃক্ষশ্রেণী আর পান্থশালা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। নিজের দেশেই যে শুধু তিনি এসব ব্যবস্থা করেছিলেন, তা নয়, দেশের বাইরে বিদেশী রাজাদের রাজ্যেও করেছিলেন। মানুষ ও পশুর চিকিৎসালয় তৈরী হ'ল। এ সব চিকিৎসালয়ে ব্যবহারের জন্য যে সব ভেষজ লতাগুল্মের প্রয়েজন হ'ত—সে সব যেখানে যা' নেই, সেখানে তা সংগ্রহ ও রোপণ করে দিয়েছিলেন। যজ্ঞার্থে অপ্রয়োজনে জীবহত্যা সর্বত্র হ্রাস পেল। আহারার্থে প্রাণীবধ নিবারণের জন্য তিনি নিজে আমিষ খাদ্য পরিত্যাগ করেছিলেন, যদিও

সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে তিনি কোনো নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন নি'। শুধু বৎসরের মধ্যে কয়েকটি দিনে জীবহত্যা করা উচিত নয়, একথা ঘোষণা করেছিলেন।

তাঁর সময় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজকেও যে কোন সভ্য দেশ অশোকের শিলাস্তম্ভ, গুহানিবাস, স্তূপ ও কাষ্ঠনির্মিত রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখে বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় নির্বাক হ'য়ে যায়। জনৈক পুরাতত্ত্ববিদ্ বলেছিলেন, দু' হাজার বছর আগেকার এই সব সুন্দর ও জীবিত স্মৃতি-চিহ্নগুলি দেখলে শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানাতে ইচ্ছে করে।

এমনি ক'রে যখন ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থান অধিকার ক'রেছে, তখন পৃথিবীর অন্যত্র অনুসন্ধান ক'রলে দেখা যায়—এশিয়া মাইনর, গ্রীস, ও মিশর গৃহযুদ্ধ ও কলহে লিপ্ত, মহাবীর আলেকজাণ্ডারের বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন; হ্যানিবল দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। আর বৃটনরা? বৃটনরা তখন অসভ্যতার কালো অন্ধকারে মগ্ন। অশোকের প্রায় ৫০ বছর পূর্বে গ্রীক বণিক পীথাস্ টিনের খনির সন্ধানে ইংলণ্ডের করণাল-এ অবতীর্ণ হন এবং সর্বপ্রথম বৃটনকে সভ্যজগতের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ক'রে দেন।

এক মনীষী অশোক সম্বন্ধে যা বলেছেন, আমি আজ তাই বলে এ আলোচনা শেষ করব:

"Thus Asoka rules the minds and destinies of millions of men and women even to-day. The yellow robe of the monk-king shines brighter than the purple robes of all the sovereigns who have filled the pages of history. Asoka's soul indeed is like a star, it dwells apart."

এইভাবে অশোক আজো লক্ষ লক্ষ 'জনগণ মন অধিনায়ক' ও ভাগ্য বিধাতা। ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজরাজন্যগণের রক্তোজ্জ্বল পরিচ্ছদের চেয়ে শ্রমণ-সম্রাটের গেরুয়া বসন আজো অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে। (ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়) অশোকের আত্মা দূরদিগন্তে অবস্থিত নিঃসঙ্গ একটি নক্ষত্রের মত।

উইলিয়াম ওয়ালেস



সে আজ অনেক দিনের কথা। আজকের মত ইংল্যাণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড তখন এক রাজার অধীনে ছিল না। তারা ছিল পৃথক পৃথক দেশ, পৃথক পৃথক রাজার শাসনে। আজকের দিনের আত্মীয়তার বদলে তাদের পরস্পরের মধ্যে ছিল দারুণ শত্রুতা। প্রত্যেক দেশই সর্বদা সুযোগ খুঁজত কেমন ক'রে অপর দেশকে অধীনে আনবে—বশ্যতা স্বীকার করাবে—নয়ত

অত্যাচারে জর্জরিত ক'রে তুল্‌বে। খণ্ডযুদ্ধ ছিল তাদের দৈনিক জীবনের অঙ্গ।

এ গল্প হচ্ছে ইংল্যাণ্ড আর স্কট্‌ল্যাণ্ডকে নিয়ে। যখনকার কথা বল্‌ছি, তখন স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন তৃতীয় আলেকজাণ্ডার, আর ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম এড্‌ওয়ার্ড। প্রথম এড্‌ওয়ার্ডের প্রথম থেকেই একান্ত বাসনা ছিল স্কট্‌ল্যাণ্ডকে তাঁর রাজ্যভুক্ত করা। তৃতীয় আলেকজাণ্ডার অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজপুরুষেরা আলেকজাণ্ডারের জনৈক আত্মীয়, জন্‌ বেলিয়লকে রাজা ব'লে ঘোষণা করেন। এই নির্বাচন এড্‌ওয়ার্ডের মনঃপূত হয় নি; কাজেই তিনি আর দেরি না ক'রে স্কটদের নতুন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা ক'রলেন। ইংল্যাণ্ডের অসংখ্য সৈন্য অতর্কিত আক্রমণে স্কটল্যাণ্ডের সৈন্যদের ডানবারের যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাস্ত ক'রল। বেলিয়ল্‌ সিংহাসনচ্যুত হ'লেন। স্কট্‌ল্যাণ্ড তার স্বাধীনতা হারিয়ে কিছু দিনের মত ইংল্যাণ্ডের বশ্যতা স্বীকার ক'রল।

দেশ জয় করা এক কথা, লোকের মন জয় করা আর এক কথা। স্কট্‌ল্যাণ্ডের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর জনৈক ইংরেজ শাসন-কর্তা স্কট্‌ল্যাণ্ডের শাসনভার গ্রহণ ক'রলেন; ইংরেজ সৈন্য নিয়োজিত হ'ল স্কট্‌ল্যাণ্ডের শান্তিরক্ষার জন্যে। কিন্তু পোষণের বদলে শোষণের ও শাসনের বদলে নির্যাতনের ফলে বিশৃংখলা গেল বেড়ে, শান্তি-রক্ষকদের পীড়নে অশান্তি আর প্রতিজিঘাংসার আগুন ছড়িয়ে প'ড়ল

সর্বত্র। স্কটল্যাণ্ড যখন এমনি অত্যাচারে জর্জরিত হ'য়ে উঠেছে, তখন সে খুঁজে পেল এমন একজন, যাঁর পণ হ'ল স্কটল্যাণ্ডকে। অত্যাচার থেকে বাঁচানো, তাঁর লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনা। ইনি হচ্ছেন উইলিয়াম ওয়ালেস্।

অতি শৈশব থেকেই উইলিয়ামের মন বিদেশীদের বিরুদ্ধে ঘৃণায় আর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল। কৈশোরের প্রারম্ভে একদিন সে মাছ ধরে বাড়ী ফিরছিল। মাছ শিকার ক'রেছিল সে অনেক —তার সঙ্গের ঝুড়িটা ভর্তি ছিল মাছে। পথে তার সঙ্গে কয়েকজন ইংরেজ সৈন্যের দেখা হ'ল। তারা মাছ চাইলে উইলিয়ামের কাছে। উইলিয়াম এত মাছ ধরেছিল যে, দু'চারটে দিতে তার কোনো আপত্তি হ'ল না। কিন্তু তারা ঝুড়িশুদ্ধ মাছ দাবি ক'রে বস্‌ল! 'উইলিয়ামের মত দেহের ও মনের বল যার আছে, সে এরকম দাবি কখনও গ্রাহ্য করে—না সহ্য করে? তাই সৈন্যেরা 'বিজিত দেশের এই বালকের ধৃষ্টতা দেখে উইলিয়ামের গালে চড় কসিয়ে দিল। উইলিয়াম দিগ্-বিদিগ্ জ্ঞান শূন্য হ'য়ে উঠল এই অপমানে। তার কাছে থাকার মধ্যে ছিল মাছভর্তি ঝুড়ি আর ছিপ্; তাই উপায়ান্তর না দেখে ছিপ্ দিয়েই ভীষণ জোরে মার্‌ল একটা সৈন্যের মাথায়। সৈন্যটা সঙ্গে সঙ্গে জখম হয়ে পড়ে গেল, আর উইলিয়াম সেই সৈন্যের তরোয়ালটা কেড়ে নিয়ে আক্রমণ ক'রল আর সকলকে। গত্যন্তর না দেখে সৈন্যের দল যুদ্ধের বদলে দৌড়ের প্রতিযোগিতা ক'রে অবিলম্বে

অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু এই ঘটনার পর সেই সহরে উইলিয়াম হয়ে উঠ্‌ল ইংরেজের প্রকাশ্য শত্রু। অগত্যা তাই সে অন্য সহরে, অন্য নামে বসবাস আরম্ভ কর্‌ল।

কিন্তু যার মনে জ্বলে উঠেছে আগুন, তার সহর বদল করা বৃথা, যদি না হয় তার মনের বদল। কিছুদিন নতুন সহরে থাকার পর এক একটি ক'রে বিচিত্র ঘটনা ঘটতে লাগল। একদিন উইলিয়াম তার নববধুকে নিয়ে খুব সাজসজ্জা ক'রে সহরের মধ্যে বেড়াতে যাচ্ছিল। পথে ইংরেজ শাসন-কর্তা সৈন্য পরিবৃত হ'য়ে আস্‌ছিলেন। তিনি হঠাৎ এক সৈন্যকে হুকুম দিলেন উইলিয়ামকে বন্দী ক'রে আন্‌তে। তার অপরাধ, গোলামের জাত হয়ে কেন সে এত সাজগোজ করবে? যে সৈন্যটি এগিয়ে গেল, তার দুর্ভাগ্য! উইলিয়ামকে বন্দী করার চেষ্টা করতেই তার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। অম্‌নি সসৈন্যে শাসনকর্তা আক্রমণ ক'রলেন উইলিয়াম আর তার স্ত্রীকে। উইলিয়ামের বাড়ী কাছেই ছিল; তাই সে আর তার স্ত্রী ছুটে গিয়ে তখনকার মত রক্ষা পেল দরজা বন্ধ ক'রে। শাসনকর্তা ছাড়বার পাত্র নন্, তিনি হুকুম দিলেন দরজা ভাঙ্গতে। কিন্তু লোহার দরজা ভাঙ্গাও সহজ নয়। এদিকে স্ত্রীর অশেষ অনুরোধ ও চোখের জলে বাধ্য হ'য়ে উইলিয়াম পিছনের দরজা দিয়ে পালানই স্থির ক'রলেন। পিছনের দরজায় যে সৈনিক ছিল পাহারায়, অতি সহজেই তার ভবলীলা শেষ করে উইলিয়াম দিল দৌড়। যখন শাসনকর্তা

উইলিয়ামের পালানোর কথা জান্‌তে পারলেন, তখন তিনি একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। তাঁর ক্রোধের আগুনে উইলিয়ামের বাড়ী আগুনে গেল পুড়ে, সেই সঙ্গে পুড়ে মরল উইলিয়ামের স্ত্রী। উইলিয়াম এতটা পাশবিক অত্যাচার আশা করে নি। একটি নিরপরাধ রমণীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার কথা তার মনের মধ্যে স্থানই পায় নি'। উইলিয়ামের মনে প্রতিহিংসার দুর্নিবার বাসনা তখন মাথা তুলে দাঁড়াল! এর পর থেকে উইলিয়াম লুকিয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল তার অতৃপ্ত প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজে খুঁজে। সে গোপনে সৈন্য সংগ্রহ ক'রতেও সুরু করলে। অবশেষে উইলিয়াম তার সৈন্য নিয়ে দাঁড়াল ইংল্যাণ্ডের সাম্‌নে যুদ্ধ ক'রবে বলে, প্রতিশোধ নেবে বলে। ষ্টারলিং ব্রিজের যুদ্ধে উইলিয়াম জয়ী হ'ল। উইলিয়াম তার সৈন্য নিয়ে হয়ে উঠ্‌ল দুর্ধর্ষ। হত্যা সুরু ক'রল সে দু'হাতে। উইলিয়ামের সৈন্যেরা কিন্তু উইলিয়ামকেও ছাড়িয়ে গেল; তাদের সামলানো শক্ত হয়ে উঠল—এমনি খুনের নেশায় মত্ত হ'য়ে উঠেছিল তারা। উলিয়াম কিছুদিনের মত স্কট্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আন্‌ল। লোকে কৃতজ্ঞচিত্তে তাকে নাম দিল 'রাজ্যের রক্ষক'।

এর পরই প্রথম এডওয়ার্ড এক বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে উইলিয়ামের মুষ্টিমেয় সেনাদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ক'রলেন ফল্‌কার্কের যুদ্ধে। উইলিয়াম আবার পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু এবার তাঁর নিজের দেশেরই একজন লোক বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে

তুলে দিলে তাঁকে ইংরেজের হাতে। আইনঅনুসারে তার বিচার হ'য়ে ফাঁসী হ'ল। তার দেহটাকে চারভাগে ভাগ ক'রে স্কটল্যাণ্ডের চারটি বিখ্যাত সহরে বিদ্রোহীর শোচনীয় পরিণতির সাক্ষ্য স্বরূপ ঝুলিয়ে রাখা হ'ল। এমনি ক'রে স্বাধীনতার বেদীতে উইলিয়াম নিজেকে বলি দিলেন। তিনি যে স্বাধীনতা ফিরিয়ে এনেছিলেন, তা স্থায়ী না হ'লেও পরে স্কট্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আবার ফিরে পাওয়া সম্ভব হ'য়েছিল উইলিয়ামের জন্যই। উইলিয়ামই পরাধীন স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতার যজ্ঞে প্রধান হোতা ও প্রধান বলি! তাঁরই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়েই পরবর্তী কালে স্কটল্যাণ্ডের আর এক দেশসেবক স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার ক'রে ছিলেন—তাঁর নাম রবার্ট ব্রুস্। প্রায় তিন শত বৎসর স্কটল্যাণ্ড স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ড আর ইংল্যাণ্ড এক হ'য়ে গেল প্রথম জেমস এর রাজত্বে।

কিন্তু আজও ইউলিয়াম ওয়ালেসের কথা স্মরণ ক'রে স্কটল্যাণ্ডের প্রত্যেক লোকেরই গর্বে ও গৌরবে বুক উঁচু হ'য়ে ওঠে—শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়।



ভাসা

ইউরোপে সুইডেন নামে একটি দেশ আছে। আমার গল্প সুইডেনের একটি ছেলেকে নিয়ে—নাম তার গুস্‌টাভাস ভাসা। সুইডেনের পাশেই ডেনমার্ক। যখনকার কথা বলছি তখন ডেন্‌মার্কের রাজা ক্রিস্‌টানের নিত্যকার অত্যাচারে সুইডেন জর্জরিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্পূর্ণভাবে বশ্যতা স্বীকার করে নি। সেই সময়ে সুইডেনের এক সম্ভ্রান্ত বংশে একটি শিশুর জন্ম হয়—আজ থেকে প্রায় পাঁচশ' বছর আগে। ভাসার পিতা ভাসাকে মানুষ করে তুলতে

চেষ্টার ত্রুটি করেন নি ; এবং তাঁর সে-চেষ্টা বিফলে যায় নি। ভাসার ছোট বেলার একটা ছোট ঘটনা থেকে দেখা যাবে তার কিশোর মনের প্রকৃত ছবি

একদিন তিনি সন্ধ্যাবেলা তাঁর পিতার সঙ্গে বাড়ী ফিরছিলেন। পথিমধ্যে কোনো এক স্থানে সাপের ভয় থাকাতে তাঁরা অন্য এক পথ দিয়ে যেতে বাধ্য হ'লেন। কিন্তু ভাসা বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে উঠলেন সেই পথের অজ্ঞাত পথিকদের বিপদ ভেবে। পরদিন সকাল বেলা কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি এক মস্ত লাঠি নিয়ে হাজির হ'লেন সেই সর্পসঙ্কুল স্থানে। সেখানে সাপের কিন্তু অভাব ছিল না, এবং সেই সঙ্গে অভাব ছিল না কিশোর ভাসার বাহুতে বল ও মনেতে সাহসের। এম্‌নি ক'রে সারাটা বেলা কাটল' অসংখ্য সর্পসংহারে। যখন শিকার করবার মত সাপ আর মিল্‌ল না, তখন শিকারী ভাসা বাড়ী ফিরলেন সারাদিনের শিকারে ভর্তি মস্ত এক ঝুড়ি নিয়ে। বাড়ীর লোকে ত ব্যাপার দেখে ভয়ে অবাক! তখন বিজয়ী ভাসা ধীরে ধীরে শুনালেন সকলকে তাঁর অভিযানের কাহিনী। ভাসার উদ্বিগ্ন ও শংকিত পিতা তিরস্কার সুরু করে দিলেন। প্রথমটা ভাসা একটু বিস্মিত হ'লেন। কিন্তু তার পরক্ষণেই একমুখ হেসে উত্তর দিলেন, "বা রে, আমি কি দোষ করলুম ? তুমিই না আমাকে ব'লেছ পরের উপকার করতে! আমি

যদি ওগুলোকে না মারতুম, তাহলে ঐ পথের কত লোককেই তো তারা কামড়াত! তুমি ত কতদিন আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ব'লেছ সকলের উপকার করতে, ভাল করতে। আর আজ আবার বক্‌ছ কেন?" লজ্জিত ও আনন্দিত পিতা নিবিড় স্নেহে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধ্যে যুদ্ধবিজয়ী শিশু-পুত্রকে।

ভাসা অতি শৈশবেই দেশকে ভালবাসতে শিখেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, যতদিন না ডেনরা দেশ থেকে বিতাড়িত হচ্ছে, ততদিন দেশের সত্যিকার উন্নতি ও মঙ্গল হওয়া অসম্ভব। তাই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে উঠল ডেনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, যুদ্ধ করে তাদের দেশ থেকে দূর করে দেওয়া।

এ সময়ে পুনর্বার ডেনমার্কের রাজা ক্রিস্‌টান্‌ এলেন এক বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুইডেনকে সম্পূর্ণভাবে জয় করার আশায়। সুইডেনের সম্ভ্রান্ত লোকেরা দেশরক্ষা করবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দলবদ্ধ হলেন। কিশোর ভাসা পিতাকে ধরে বসলেন দেশের হয়ে যুদ্ধে যাবেন ব'লে। যুদ্ধ হ'ল, কিন্তু ডেনমার্কের সুশিক্ষিত সংখ্যাতীত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সুইডেনের অর্ধশিক্ষিত দেশব্রতীরা পারবে কেন? জীবিত ও পরাজিত সুইডেনবাসীরা সকলেই বন্দী হ'ল। গস্‌টাভাস্‌ ভাসা ও তাঁর পিতাও বন্দী হ'লেন। প্রথমে বিজয়ী

ক্রিস্টান্ জানিয়েছিলেন যে, রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হলেই বন্দীরা মুক্তি পাবে। কিন্তু তিনদিনের দিন একটি একটি করে বন্দী হত্যা আরম্ভ হ'ল। এমনি করে ডেন সৈন্যরা হত্যা ক'রল অনেক সম্ভ্রান্ত সুইডেনবাসীকে, হত্যা করল ভাসার পিতাকে। তখনও ভাসা ও তাঁর কতিপয় দেশের লোক জীবিত। তাঁদের মৃত্যুদণ্ড হবে পরের দিনে। ভাসার ছোট্ট মাথাটিতে এ ক'দিন শুধু পালাবার চিন্তা ছাড়া আর কিছু ছিল না। পিতার মৃত্যুশোক সামলে তিনি ভাবছিলেন পালাবার উপায় ও তারপর শত্রুর উপর প্রতিশোধ নেবার কথা। উপায় মিলে গেল। মৃত্যুমুখী বন্দীদের ভাসা বললেন তাঁর পালাবার পরিকল্পনা। বললেন, কেমন করে সকলের গায়ের জামা, চাদর নিয়ে একটা শক্ত লম্বা দড়ির মত করে পাকিয়ে রাত্রিতে চুপি চুপি তারই সাহায্যে পালাতে হবে। তারা ছিল বন্দী, মস্ত একটা পুরোণো পাথরের বাড়ীর সব থেকে উপর তলায়। নীচের দরজা ছিল বন্ধ। কিন্তু বন্দীরা বলল, 'ও রকম ক'রে কাজ নেই, যদি ধ'রে ফেলে ত তক্ষুনি সোজা ঝুলিয়ে দেবে। হয়ত সকালে রাজা মুক্তি দিলেও দিতে পারে, কারণ মুক্তির কথাটা ত একবার উঠেছিল।' কিন্তু তারা ভাসাকে বাধা দিল না, বরঞ্চ সাহায্য করল তাদের গায়ের সমস্ত জামা কাপড় দিয়ে। আর দিল তারা ভাসাকে যাবার সময় তাদের বুকভরা আশীর্বাদ। ভাসা অতি সাবধানে সেই কাপড়ের তৈরী দড়িটা বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে গেলেন।

সে-রাত্রে সৌভাগ্যবশত প্রহরী কম ছিল। যারা ছিল, তারাও উৎসবের কৃপায় আর প্রকৃতিস্থ ছিল না।

বাইরে মাটিতে পা' দিয়েই ভাসা দৌড়ুতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে সহর ছাড়িয়ে গেলেন, তবু দৌড়ের শেষ নেই। তাঁর মনে হ'ল হয়ত দৌড়ের শেষ মানেই জীবনের শেষ। সকালের আলো ফুটল। ভাসা পথ ছেড়ে বনের পথ ধরে লুকিয়ে চলতে সুরু করলেন। চলতে চলতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন গাছের তলায়। এক বৃদ্ধ রাখাল তখন বাড়ী ফিরছিলেন, সেদিক দিয়ে। পথের উপর গাছের তলায় একটি মৃত-প্রায় সুন্দর ছোট ছেলে দেখে তার কৌতুহল হ'ল, দয়া হ'ল। রাখাল তাঁকে আনল বাড়ীতে। আহারে ও সেবায় তাকে সুস্থ করে তুলল। ভাসা তখন সব কথা খুলে বললেন রাখালকে এবং জানালেন তাঁর সংকল্প। রাখালও অনেক বোঝাল যে, সে অতটুকু ছেলে কেমন করে পারবে অতটা করতে। কিন্তু যাঁর বুকে প্রাতহিংসার আগুণ জ্বলে উঠেছে, তাঁকে কি নিবৃত্ত করা যায় অত সহজে?

পরের দিন ভাসা আবার যাত্রা সুরু করলেন রাখালের বেশে। যাবার বেলায় বৃদ্ধরাখাল বলল, সে সংসারে একা, সামর্থ সামান্য, সে জানেনা ভাসাকে কেমন করে সাহায্য করবে, তাই সে সুইডেনের

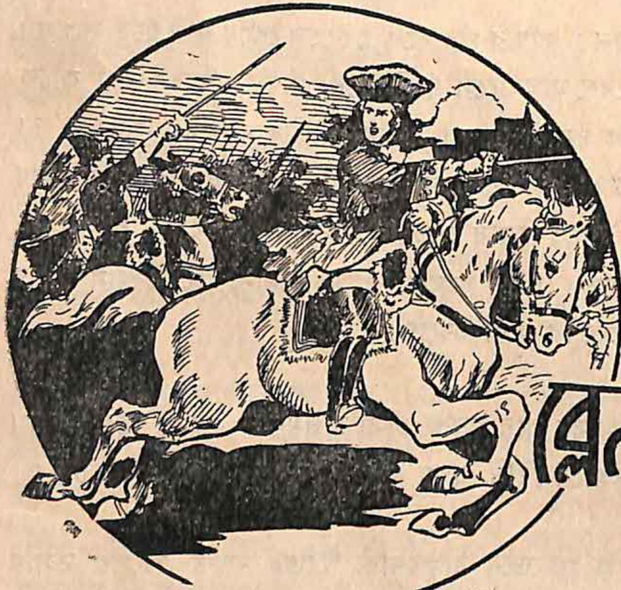
সেবায় ব্যবহৃত পূর্বপুরুষের তলোয়ারখানা ভাসাকে উপহার দিল। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের একটা আশ্চর্য সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল; ভাসা অনুভব করলেন যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ!

ভাসা যাকে সামনে পান তাকেই বলেন নতুন রাজার অত্যাচারের কথা ও জানান স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার সংকল্প। কিন্তু সকলেই ত্রস্ত, সকলেই পিছিয়ে গেল। ভাসা দুর্দশার শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছেন। অনাহারে পথশ্রান্ত, ছিন্ন মলিনবসন, রক্তাক্ত নগ্নপদ বিষাদমাখা চেহারা, চোখে জল; এমনি অবস্থায় ভাসা গিয়ে হাজির হ'লেন মস্ত এক নগরে, যেখানে একত্রে বহু নরনারী আনন্দোৎসবে মত্ত। ভাসা সকলকার মাঝখানে একটা উঁচু জায়গায় উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে নিবেদন করলেন তাঁর কথা শুনতে। তিনি বললেন তাঁর করুণ কাহিনী, দেশের শোচনীয় অবস্থা ও রাজার অত্যাচারের বিবরণ। সকলে উত্তেজিত হয়ে উঠল এই দুঃখ কষ্টের শিশুপ্রতিমূর্তিকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল তারা প্রতিকার এর করবেই— অস্ত্রশস্ত্রও যোগাড় হল। দেখতে দেখতে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ল, সামনে, পিছনে, আশেপাশে সর্বত্র। শীঘ্রই এই অগ্নি-তরঙ্গ গড়িয়ে চলল রাজধানী ষ্টক্‌হলম্-অভিমুখে। আর তার দলপতি হ'লেন সেই ছোট্ট ভাসা। সেই ত তাদের গুরু, সেই ত অগ্রণী—স্বাধীনতা-যজ্ঞে তাদের সংগ্রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন,

জাগিয়ে তুলেছেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধে সুইডেন শেষে জয়ী হতে লাগল। যেখানে সমস্ত দেশ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেখানে বিদেশীয়েরা কাকে সামলাবে, কাকে দমন করবে। ভাসার জীবনের স্বপ্ন সত্য হ'ল। ডেনরা বিতাড়িত হ'ল সুইডেন্ থেকে। সকলে এসে অনুরোধ করল ভাসাকে রাজা হবার জন্যে। কিন্তু ভাসা রাজী হ'লেন না তখন মুকুট পরতে। তিনি সকলের প্রভুত্ব চাননি, চেয়েছিলেন—আর সকলের মতই দেশের সেবা করতে।

প্রায় ৬০ বৎসর পরে অবশ্য ভাসা রাজমুকুট গ্রহণ করেছিলেন। সুইডেনের ইতিহাসে তিনি প্রথম গুস্‌টাভাস্ ভাসা নামে পরিচিত।

কিন্তু আজও সুইডেনে ঠাকুরমারা শীতের রাতে লেপের তলায় তাঁদের নাতী-নাতনীদের গুস্‌টাভাস্ ভাসার কাহিনী বলেন—শুনে শিশুদের মন তাদেরই মত একশিশুর গৌরবে, আনন্দে ও উৎসাহে ভরে ওঠে।



ব্লেন্‌হিম্‌

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধগুলির মধ্যে ব্লেন্‌হিমের যুদ্ধ অন্যতম। ব্লেন্‌হিমের যুদ্ধ হয় ১৩ই আগষ্ট, ১৭০৪ সালে। ব্লেন্‌হিমের যুদ্ধ বর্ণনার পূর্বে তদানীন্তন ইউরোপের এবং বিশেষ করে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বৈদেশিক নীতি সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ইংলণ্ডে দ্বিতীয় জেমস্‌ তাঁর পূর্বপুরুষদের পদানুসরণ করে রাজশক্তির অপব্যবহার করেন, শাসনতন্ত্রের অসম্মান করেন

ইংলণ্ডের জননায়কেরা মেরী ও তাঁর স্বামী হল্যাণ্ডের অরেঞ্জবংশীয় রাষ্ট্রপতি উইলিয়ামকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ ক'রতে আমন্ত্রণ করলেন। উইলিয়মের সঙ্গে তখন ফরাসী নৃপতি চতুর্দশ লুইয়ের শত্রুতা চল্‌ছিল। লুইয়ের বিশেষ বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন দ্বিতীয় জেমস্। সুতরাং উইলিয়ম ইংলণ্ডের আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রতে দ্বিধা বোধ ক'রলেন না। উইলিয়াম ওলন্দাজ সৈন্যসহ ইংলণ্ডে উপস্থিত হ'য়ে সিংহাসন গ্রহণ ক'রলেন। জেমস্ পালিয়ে গিয়ে ফরাসী দেশে আশ্রয় গ্রহণ ক'রলেন। এমনি করে ১৬৮৮ সালে বিনা রক্তপাতে ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব অনুষ্ঠিত হ'ল।

ইংলণ্ডের রাজশক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতিতেও পরিবর্তন দেখা দিল। রাণী এলিজাবেথের সময় থেকে ক্রমওয়েলের আমল পর্যন্ত ইংলণ্ডের সঙ্গে স্পেনের প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না। দ্বিতীয় চার্লস্ ও জেমসের বৈদেশিক নীতির অন্যতম অঙ্গ ছিল ইংলণ্ডের নৌ-শক্তি ও বাণিজ্য নষ্ট করা এবং ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখা। উইলিয়ম যখন ইংল্যাণ্ডের রাজমুকুট সাগ্রহে গ্রহণ ক'রলেন, তখন ফ্রান্সের শত্রুতায় হল্যাণ্ড বিপন্ন। হল্যাণ্ডের স্বপক্ষে ইংলণ্ডের সাহায্য লাভ উইলিয়মের একান্ত কাম্য ছিল।

ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইয়ের দুর্নিবার রাজ্যলিপ্সা তখন প্রতিবেশি রাজ্যে আতংকের সৃষ্টি ক'রেছে। লুইয়ের রাজ্যবিস্তারে বাধা দিবার

অভিপ্রায়ে উইলিয়াম স্পেন ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন ক'রলেন। ইংরাজেরা উইলিয়মের এ নীতি সমর্থন করেন নি। উপরন্তু, তাঁরা মনে ক'রলেন যে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় তাদের কোনো স্বার্থ নেই। কিন্তু উইলিয়মের ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণের ফলে ও ফরাসী রাজ লুইএর পলাতক রাজা জেমসকে আশ্রয় দানের ফলে, ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র নীতিরও আমূল পরিবর্তন ঘট্‌ল। ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের বাধল যুদ্ধ। দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধে জয়পরাজয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত ও শ্রান্ত হয়ে উভয় পক্ষই ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি করতে বাধ্য হ'ল। লুই উইলিয়মকে 'ইংলণ্ডের রাজা বলে স্বীকার করে নিলেন। সাময়িক ভাবে সমরানল উপশান্ত হ'ল, কিন্তু নির্বাপিত হ'ল না।

স্পেনের বিশাল রাজ্যের নৃপতি দ্বিতীয় চার্লসের পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর চরম পত্রে দেখা গেল যে, তিনি তাঁর ভাগিনেয় পুত্র ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইয়ের পুত্রকে তাঁর সমগ্র রাজ্য দিয়ে গেছেন। ফ্রান্স ও স্পেন একই রাজার অধীনে এলে দুর্জয় শক্তির অধিকারী হ'য়ে উঠবে, এই আশংকায় সমগ্র ইউরোপ শংকিত হয়ে উঠল। উইলিয়মও খুব শংকিত হলেন, এবং তার এই শংকা লুইএর প্রতি বিরোধিতায় আত্মপ্রকাশ কর্‌ল। লুই মৃত দ্বিতীয় জেম্‌সের পুত্রকে ইংলণ্ডের রাজা বলে ঘোষণা করলেন।

ইংলণ্ড তখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, এবং দেখতে দেখতে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল চারদিকে। ইতিহাসে এই যুদ্ধ স্প্যানিস্ উত্তরাধিকারযুদ্ধ নামে পরিচিত। এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় উইলিয়মের মৃত্যু হ'ল এবং রাজকুমারী য়্যান ইংলণ্ডের রাণী হলেন।

বিচক্ষণতা ও যোগ্যতার অভাবে রাণী য়্যান (Anne) রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁর অন্তরঙ্গ বাল্য বান্ধবী স্যারা জেনিংস কর্তৃক পরিচালিত হ'তেন। স্যারা জেনিংসের স্বামী জন চার্চিল এ জন্য রাজদরবারে বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। চার্চিল মার্লবরোর ডিউক নামে পরিচিত ছিলেন। ইংরাজরা মনে করেন, মার্লবরোই সে যুগের শ্রেষ্ঠ বীর এবং ব্লেন্‌হিমের যুদ্ধ জয়ই মার্লবরোর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

১৭০২ সালে মার্লবরো ইংরাজ ও ওলন্দাজ সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন। তখন ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও আরও কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাদের আন্তরিক ঐক্যের অভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। বেলজিয়াম তখন স্পেনের অধীন। হল্যাণ্ড আশংকা ক'রেছিল, বেলজিয়মের ভিতর দিয়ে ফ্রান্স তাকে আক্রমণ ক'রবে। এদিকে মার্লবরো বেলজিয়মের লিজ (Lige) নগর দখল ক'রে হল্যাণ্ডের ফরাসী-আক্রমণের আশংকা দূর করলেন।

১৭০৪ সালে ব্যাভেরিয়ার ভিতর দিয়ে ফ্রান্স অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করল। মার্লবরোও অন্যদিক থেকে অগ্রসর হ'য়ে শত্রুর সম্মুখীন হ'লেন। এ যুদ্ধে ফরাসীরা পরাজিত হল ও অষ্ট্রিয়া রক্ষা পেল। এই যুদ্ধই ব্লেন্‌হিমের যুদ্ধ।

মার্লবরো নেকার নদী পার হয়ে জার্মাণীর মধ্য দিয়ে দানিয়ূব নদীর দিকে যাত্রা স্থরু করলেন। বহু কষ্টে উটেনবার্গ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এসে দানিয়ূব পার হ'য়ে, ব্যাভেরিয়ার অন্তরদেশ ভেদ করার আয়োজন করাই হ'ল তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু ফরাসী সেনাপতি মার্শাল ট্যালার্ড ৩০,০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে এলেন ব্যাভেরিয়ার রাজাকে সাহায্য করতে। মার্লবরোর পাশেও এসে দাঁড়ালেন, তাঁর মিত্র ইউজিন্ সসৈন্যে। দানিয়ূবের পশ্চিম পাড়ে ব্লেন্‌হিম গ্রামের কাছে মিত্রশক্তির সৈন্য সমাবেশ হ'ল। ইংরাজ, ডাচ, হ্যানোভার, ডেন, অষ্ট্রিয় সেনাদল একদিকে আর অন্যদিকে ফরাসী ও ব্যাভেরিয়ার প্রায় ৫০,০০০ সৈন্য অপেক্ষা ক'রছিল একটি ছোট নদীর পাড়ে জলাভূমি ও দানিয়ূবের মধ্যে। তাদের সামনে জলাভূমি, ডানদিকে দানিয়ূব, বাঁ দিকে পার্বত্য প্রদেশ। ট্যালার্ড তাঁর জগদ্‌বিখ্যাত সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে এলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল ১৩ই আগষ্ট। মার্লবরো তাঁর অদ্ভূত সাহস, দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জলাভূমির ওপর দিয়ে সৈন্য নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ইউজিন্ আক্রমণ

করলেন ব্লেন্‌হিম গ্রামের পাশ থেকে। মার্লবরোর, প্রথমে ছিল পদাতিক সৈন্য, তারপর অশ্বারোহী, তারপর আবার পদাতিক এবং তাদের পিছনে ডচ্ বা ওলন্দাজ সৈন্যদল। তাঁর প্রথম দুইবারের আক্রমণ ব্যর্থ হ'ল ; তৃতীয়বারে অসীম ও দুর্জয় চেষ্টায় ফরাসী সৈন্য পিছিয়ে গেল। আক্রমণের ফলে ছোট ব্লেন্‌হিম গ্রামে অত্যধিক ফরাসী সৈন্য আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ল। একান্ত স্থানাভাবে ব্লেন্‌হিম গ্রামে বিশাল ফরাসী সৈন্য অকর্মণ্য হ'য়ে গেল। ট্যালার্ড বন্দী হলেন এবং শেষ পর্যন্ত ফরাসী সৈন্য আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'ল।

ইংলণ্ডের রাণী য়্যান দুশ্চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। লেডি স্যারা মার্লবরো তাঁকে জরুরী পত্রবাহকের হাতে মার্লবরোর নিকট থেকে সদ্য পাওয়া—এক চিঠি পাঠিয়েছিলেন। মার্লবরো লিখেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ১৪ আগষ্ট, ১৭০৪ : স্যারা, বিশেষ ব্যস্ত আছি, আমাদের রাণীকে জানিও, তাঁর সেনাপতি ও সৈন্যবাহিনী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। ফরাসী সেনাপতিরা, বিশেষ করে মার্শাল ট্যালার্ড আমার ঘোড়ার গাড়ীতে বসে আছেন। পরে বিস্তৃত বিবরণ পাঠাব। এই পত্রবাহক পার্ক স্বচক্ষে দেখেছে, বিখ্যাত ব্লেন্‌হিমের যুদ্ধে ইংলণ্ডের জয়পতাকা।

রাণী য়্যান ও ইংলণ্ডের অসংখ্য নরনারী বিজয়োৎসবের আয়োজন করলেন। বন্দীদের প্রতি মার্লবরো সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার

করেছিলেন। তিনি ট্যালার্ডকে বলেন, "আমি আপনাকে সম্মান করি। আপনার আশাতীত দুর্ভাগ্যের জন্য আমি দুঃখিত।" ট্যালার্ড উত্তর দেন—"আপনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করতে পেরেছেন বলে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।" একটি সুদর্শন আহত ফরাসী বীর যুবককে মার্লবরো বলেন, "তোমার মত লোক যদি ফ্রান্সে বেশী থাকে তাহলে তোমাদের রাজা আবার জয়ী হবেন।" যুবক উত্তর দেয়, "ফ্রান্সে আমার মত লোকের অভাব, নেই, তোমার মত সেনাপতির অভাব আছে।"

এমনি করে ব্লেন্‌হিমের যুদ্ধক্ষেত্রে চিরদিনের মত চতুর্দশ লুইয়ের পররাজ্যলোলুপতার অবসান ঘট্‌ল। ফ্রান্সের বিখ্যাত সেনাপতি আর সৈন্যবাহিনী মিলে ইউরোপে যে আশংকার সৃষ্টি ক'রেছিল, তার অবসান ঘটলো। ইউরোপে পুনর্বার, পররাষ্ট্র-নীতির পট পরিবর্তন হ'ল।



ইংলণ্ডে যেমন যুবরাজকে বলে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌, তেমনি ফ্রান্সের রাজপুত্রকে বলা হ'ত দোফাঁ। এখন আর বলে না, কারণ ফরাসীদের রাজা এখন কেউ নেই। তাদের শেষ রাজা ছিলেন ষোড়শ লুই আর শেষ দোফাঁ ছিলেন এই লুইয়ের ছেলে।

এ গল্প হ'ল ফরাসীদের শেষ রাজপুত্রকে নিয়ে, যাকে তা'রা বল্‌ত দোফাঁ।

দোফাঁর জন্ম হয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে। জীবনের প্রথম ক'টা বছর তার পার হ'ল বেশ সুখের মধ্য দিয়ে। সকালে পাখীর ডাকে তার ঘুম ভাঙ্‌ত, সারাদিন ফুল নিয়ে খেলা চল্‌ত—রাত্রে মায়ের কোলে এসে সে ঘুমিয়ে পড়ত; কিন্তু সুখের নীল আকাশের কোণে একদিন দেখা দিল দুঃখের কালো মেঘ। বহুদিন থেকে ফরাসীদের বুকের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ধোঁয়াচ্ছিল। ষোড়শ লুইয়ের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন অত্যন্ত ভোগবিলাসী। তাঁদের বিলাস-বাসনার যেমন অন্ত ছিল না, তেমনি তাঁদের অত্যাচারেরও সীমা ছিল না—প্রজাদের ওপর নিত্য নূতন কর বসানো আর বিবিধ উপায়ে তা' আদায় করার ব্যবস্থা। দেশের লোক দিনে দিনে হ'তে লাগল গরীব, আর অন্নকষ্টে ও অত্যাচারে প্রপীড়িত। তোমরা যখন বড় হবে তখন আরও অনেক কিছু পড়বে—এই অত্যাচারী রাজাদের আর তাদের গরীব প্রজাদের কথা। কিন্তু আপাতত তোমাদের দোফাঁর কথাই বলি।

দোফাঁর বাবা ষোড়শ লুই কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষের অত্যাচারের ধারা অনুসরণ করেন নি'। তিনি সত্যই ভাল লোক ছিলেন।

কখনো ভাল হ'তে পারে এ কথাটা লোকের বিশ্বাসের অযোগ্য ; তা'রা অত্যাচারী রাজা দেখতেই অভ্যস্ত—তাই তা'রা বুঝলে না রাজা লুইকে। তা'রা তাঁকে ঠিক আগের রাজাদের মতই ঘৃণা কর্‌ত। যে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা এতদিন লুকিয়ে ছিল ফরাসীদের বুকের মধ্যে, তা হঠাৎ আত্মপ্রকাশ ক'রে বস্‌ল ভীষণ আগুনের রূপে। ফরাসীদেশে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে গেল—এ কোন্ থেকে ও কোন্ পর্যন্ত। রাজপ্রাসাদ আক্রমণের চেষ্টা চল্‌তে লাগল—রাজাকে সপরিবারে বধ করার জন্য।

একদিন উন্মত্ত জনতা রাজপ্রাসাদ ঘিরে দাঁড়াল। প্রহরীদের মাথা বিদ্রোহীদের অস্ত্রাঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বিদ্রোহীরা নিয়ে চল্‌ল রাজাকে সপরিবারে বন্দী ক'রে প্যারী সহরে। গাড়ী চলেছে বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে—জনতা রাজার নিন্দা প্রচারে মুখর। দোফাঁ অতি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস কর্‌ল রাজাকে—"এরা এমন ক'রছে কেন বাবা ?" সিংহাসনচ্যুত রাজা বল্লেন,—"যুদ্ধের জন্যে টাকা চেয়েছিলাম ; প্রজারা তা' দিতে স্বীকার ক'রেছে কিন্তু তা' কতকগুলি অসম্ভব প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে—আর তার সঙ্গে আমার নামে মিথ্যা রটনাও করেছে যথেষ্ট।" শুনে দোফাঁর চোখে জল দেখা দিল।

দু'বছর ধ'রে রাজপরিবারের ভাগ্যাকাশে দুঃখের কালো মেঘ জমাট বেঁধে রইল। তারপর একদিন এসে বিদ্রোহীরা ছিনিয়ে নিলে

লুইকে তাঁর পরিজনগণের মধ্য থেকে। তারা ব'লে গেল, নিয়ে যাচ্ছে তাঁর বিচারের জন্য। চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি গেলেন প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। যাবার বেলায় আশ্বাস দিয়ে গেলেন—আবার দেখা হবে পরের দিনই; কিন্তু বিচারে লুইয়ের প্রাণদণ্ড হ'ল। তাই দেখা আর হ'ল না! পরের দিন সকালে উন্মত্ত জনতার উল্লাস আর দামামার ধ্বনি রাণীর কাছে খবর পৌঁছে দিল, রাজাকে ফাঁসি দেওয়া হ'য়েছে।

এর পরই অনাথা রাণীর শেষ সম্বল দোফাঁকে বিদ্রোহীরা ছিনিয়ে নিলে রাণীর কোল থেকে। দোফাঁ তখন সাত বছরের শিশু; তাই তাকে আর হত্যা করা হ'ল না, কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে অনেক ভীষণ যন্ত্রণা ঘটল তার কপালে। দোফাঁকে পাঠান হ'ল সাইমন নামে এক অতি দুর্বৃত্ত অসচ্চরিত্র লোকের কাছে। সাইমন রাখলে দোফাঁকে এক অস্বাস্থ্যকর ঘরের মধ্যে যেখানে সূর্যের আলো যায় না অথচ শীতের হাওয়ার অভাব নেই, রাতদিন ঘরের মধ্যে জল থৈ থৈ ক'রছে। এমন খাবার দিত, যা লোক কুকুরকে দিতেও লজ্জা বোধ করে; লাথি না মেরে সাইমন কোনো কথা বল্‌ত না। দোফাঁর দিন এই ভাবেই কাটতে লাগল। মাঝে মাঝে দোফাঁ তার মার

কথা জিজ্ঞেস ক'রত, কিন্তু পরিবর্তে মা'র সম্বন্ধে কটূক্তি শোনা আর প্রহার ছাড়া সাইমনের কাছ থেকে কিছুই পেত না।

দোফাঁ নিঃস্ব, তার রাজ্য গেছে, আশা গেছে, ভরসা গেছে, দেহ গেছে। এবার সাইমনের দৃষ্টি পড়লো তার নিষ্পাপ মনের উপর—আত্মার উপর। দোফাঁকে সাইমন্ জোর করে মদ খাওয়াতে আরম্ভ ক'র্‌ল। কিছুদিনের মধ্যেই দোফাঁ হয়ে উঠল একটি মাতাল। মদের নেশায় যা-ইচ্ছে-তাই যত অবান্তর কথা বলে। একদিন এ অবস্থায় সাইমন্ রাণীর নামে কতগুলো অভিযোগ লিখিয়ে নিল দোফাঁর হাত দিয়ে। এরই কিছুদিন পরে দোফাঁর আভযোগ অনুসারে রাণীর বিচার হ'ল। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'ল। বিচারের পর রাণীকে অভিযোগ পত্র দেখান হ'ল—রাণী দোফাঁর হাতের লেখায় চুমু খেলেন ও মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করে বললেন, তিনি জানেন, এ শুধু মিথ্যা ষড়যন্ত্র।

* * *

সে-দিন সকালবেলা দোফাঁ ঘুম থেকে উঠেই দেখে, একটি অপরিচিত ব্যক্তি ঘরে খাবার দিতে এসেছে ; সে এক গাল হেসে বল্লে, "ও হে ছোক্‌রা, শুনেছ তোমার মা যে আজ এতক্ষণ ফাঁসিকাঠে ঝুল্‌ছে—দিব্যি মা'র নামে লাগালে সাইমনের কাছে—"। সমস্ত

পৃথিবীটা চক্ষের নিমেষে ঘুরতে লাগল দোফাঁর চোখের ওপর—সে আর কিছু জানে না !

*　　*　　*

যখন তার জ্ঞান হ'ল, তখন চা'রদিকে জমাট অন্ধকার—কেউ কোথাও নেই। দোফাঁ চোখ বন্ধ ক'রে ভগবানকে ডাক্‌তে লাগ্‌ল তাকে তুলে নেবার জন্যে—তার মা'র কোলই যে তার একান্ত প্রয়োজন।

দোফাঁর কি হ'ল শেষ পর্যন্ত—তা কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না ! তবে সে যে তার মা'র কোল তাড়াতাড়িই ফিরে পেয়েছিল, তার কোন ভুল নেই।



জন্ ব্রাউন্

যে সব মহামানব জগতে মহান আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে জন ব্রাউনের নাম চিরস্মরণীয়। জন ব্রাউন আমেরিকায়--কালো ক্রীতদাসদের স্বাধীনতার হোমাগ্নিতে তাঁর প্রিয় পরিজনবর্গ, সম্পদ ও সম্মান—সর্বস্ব আহুতি দেন। আমার আজকের গল্প হ'বে এক পরম স্মরণীয় ঐতিহাসিক রাত্রি, আর তার দুর্দম যাত্রীদের নিয়ে। সে দিন ছিল রবিবার—১৮৫৯ সালের ১৬ই অক্টোবর। কিন্তু প্রথমেই জন ব্রাউন আর তখনকার আমেরিকার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ব্রাউনের সময় আজকের আদর্শ গ্রহণ ক'রে নি, তার চেহারাও এমনটি ছিল না। তখন যুক্তরাষ্ট্র মাত্র কয়েকটি ষ্টেট্ বা রাষ্ট্র (প্রদেশ) নিয়ে গঠিত ছিল। এই প্রদেশগুলির মধ্যে মনোমালিন্যের অন্ত ছিল না। দক্ষিণ দিকের প্রদেশগুলি দাবী ক'রত যে, কালো-ক্রীতদাস তাদের জন্তু-জানোয়ারের দলভুক্ত ব্যক্তিগত মূলধন, আর উত্তরের প্রদেশগুলি ছিল ক্রীতদাসপ্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী। যুক্তরাষ্ট্রে কালো-ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত থাক্‌বে না লোপ পাবে, এ সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ছিল যুক্তরাষ্ট্র সরকারের। সমস্ত প্রদেশগুলির প্রতিনিধি নিয়ে ওয়াশিংটনে এই সরকার গঠিত। কিন্তু ১৭৮৭ সাল থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরের প্রদেশগুলি সমান সংখ্যায় বিভক্ত ছিল। ওয়াশিংটনে দু' দিকের প্রতিনিধিও ছিল সমান সমান। ঠিক হ'ল যে, প্রত্যেক প্রদেশ ভোটের দ্বারা ঠিক করবে সেই অঞ্চলে দাসপ্রথা থাকবে কিনা। কিন্তু এই ব্যবস্থা বিরোধ ও বিদ্বেষ দিল আরও বাড়িয়ে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার তখন দুর্বল। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলার একান্ত অভাব। সীমান্ত প্রদেশগুলি পরস্পরের আক্রমণ ও অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। খণ্ডযুদ্ধ, হত্যা ও লুণ্ঠন ছিল তাদের দৈনিক কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ।

১৮৫৪ সালে জন ব্রাউন যখন ক্যানসাস-এর অধিবাসী, তখন দাসব্যবসায়ী দস্যুদের অত্যাচারে ক্যানসাস রক্তে রাঙা (Bleeding Kansas) হয়ে উঠ্‌ল। ব্রাউনের পিতা অতি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। তিনি সৈন্যবিভাগে মাংস সরবরাহ করতেন। ব্রাউন অতি শৈশবকাল থেকে সৈন্য-শিবিরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। যৌবনে ব্রাউন ইউরোপের নানা দেশে সৈন্যশিবির পরিদর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাই সৈন্যদের শিক্ষা ও পরিচালনার অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করলেও যুদ্ধের প্রতি তাঁর বিশেষ বিতৃষ্ণা ছিল। তিনি সংকল্প করেছিলেন যে, স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ থাকবে না, তাই যখন কালো ক্রীতদাস ও তাদের স্বাধীনতার শাদা পৃষ্ঠপোষকদের উপর শাদা মালিকদের অত্যাচার ছড়িয়ে পড়ল, তখন ব্রাউন এগিয়ে এলেন সপরিবারে নিপীড়িতদের নেতা হয়ে।

ব্রাউনের বয়স তখন পঞ্চাশের উপর। পরিবারে তাঁর ছেলের সংখ্যা বেশী ছিল। ছেলেদের তিনি মানুষ করেছিলেন বহু যত্নে। তাঁর যত্নের মধ্যে অগাধ স্নেহের সঙ্গে সুকঠিন নিয়মানুবর্তিতা ছিল। ব্রাউনের প্রভাবে ছেলেদের স্বাস্থ্য ও চরিত্র হল ইস্পাতের মত শক্ত ও দৃঢ়। ব্রাউনের এই সংগ্রামে সঙ্গী

হ'ল তাঁর ছেলেরাও। ব্রাউনের দল প্রভুদের কবল থেকে কালো ক্রীতদাসদের লুকিয়ে সংগ্রহ ক'রে যে সব রাষ্ট্রে দাসপ্রথা নেই, সেখানে পাঠাতে লাগল। অনেকবার ব্রাউন নিজে তাঁর কালো বন্ধুদের নিরাপদ স্থানে স্বাধীনতা দেবার জন্য সহস্র সহস্র ক্রোশ দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন। তাঁর অটুট স্বাস্থ্য ও অসীম সাহস বহু সহস্র নরনারীকে স্বাধীনতার স্বর্গসুখ দান করেছে। দাসব্যবসায়ীরা ব্রাউনদলের কার্যকলাপ লক্ষ্য ক'রে ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে উঠল। দাসবিরোধী সীমান্ত নগরগুলি আক্রমণে শংকিত হ'য়ে পড়ল।

এ সময়ে লিডেনওয়ার্থ সহরে এক নির্বাচন উপলক্ষে দাসব্যবসায়ীরা ব্রাউনের দুই বন্ধুকে অকারণে হত্যা ক'রল— নগরপাল দাসব্যবসায়ীদের ভয়ে সঙ্কুচিত; ক'দিন পরে তারা দুঃসাহসে মত্ত হ'য়ে ব্রাউনের বাড়ী আক্রমণ ক'রল; ব্রাউন এবং ছেলেরা এতদূর আশংকা করে নি। তারা বাড়ীতে ছিল না। দক্ষিণের দাসব্যবসায়ী দস্যুরা ব্রাউনের বাড়ী লুঠ ক'রল, ফসল সমেত মাঠে আগুন দিল। মেয়েদের উপর অত্যাচার আর অপমানের অন্ত রইল না। যাবার সময় দস্যুদল চোখ রাঙিয়ে ব'লে গেল যে, পরের দিন তারা এসে পলাতক পুরুষদের মুণ্ডুর হিসেব ক'রবে। ব্রাউন তখন অনেক দূরে একদল কালো

ক্রীতদাসদের নিয়ে যাচ্ছেন স্বাধীন এলাকায় যেখানে ক্রীতদাসরা স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকতে পারে ; কিন্তু তাঁর ছেলেরা বাড়ী ফিরে এসে যখন সব কিছু শুনল আর দেখল, তখন তাদের কর্ম্মপন্থা ঠিক ক'রতে বেশী সময় লাগল না। পরের দিন সকালে সকলে ভীত হ'য়ে শুনল যে, ব্রাউনের দল সেখানকার দাসব্যবসায়ীদের সব দলপতিদের ধরে নিয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের বিচার করেছে এবং ফাঁসি দিয়েছে। ভগবানের কাছে ব্রাউনের দল নির্দোষ হলেও আইনের চক্ষে দোষী হ'ল। মার্কিন সরকার ব্রাউন আর তাঁর দলভুক্ত লোকেদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের হুলিয়া জারি ক'রল। এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন দাসব্যবসায়ীদের প্রভাবে এক আইন বিধিবদ্ধ ছিল যে, পলাতক ক্রীতদাসের কঠিন দণ্ড হবে এবং ক্রীতদাসের পলায়নে যে সাহায্য ক'রবে তাকেও দণ্ডের অংশ নিতে হবে। একাধিক অভিযোগে ব্রাউন এবং তাঁর দলকে অভিযুক্ত করা হ'ল। গ্রেপ্তারের আশংকায় ব্রাউন এবং তাঁর দল ক্যানসাসের গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। সেখানে তাঁদের কষ্টের সীমা রইল না। তবু তাঁরা একটিবারও তাঁদের দৃঢ় সংকল্প ছাড়া অন্য কথা ভাবতে পারল না। তাঁরা সুযোগ বুঝে ক্রীত-দাসদের লুকিয়ে দাস এলাকার বাইরে নিয়ে যেতেন। একবার ব্রাউনের দুই ছেলে, জন ও জেসনকে শত্রুপক্ষ ধরে ফেলেছিল।

এই দুটি ছেলেকে তারা দুদিনে প্রায় ৬০ মাইল রৌদ্রে ক্রমাগত ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দৌড়ে নিয়ে যায়। ফলে দুজনেই পাগল হ'য়ে গেল।

ব্রাউন ছেলেদের উদ্ধার ক'রতে এসে লড়াই ক'রে শত্রুদের নিহত ও পরাস্ত করেন, এবং দলপতি পেটকে বন্দী করেন। কিন্তু বন্দীদের তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিলেন বিচারের জন্যে। বিচারে কি ফল হ'ল তা অনুমান করা শক্ত নয়। শত্রুরা অনতিকাল পরে, ব্রাউনের বাড়ী, ঘর, সম্পদ, লুঠ ক'রল এবং ব্রাউনের এক ছেলে ফ্রেডারিককে গুলি ক'রে হত্যা ক'রল। নির্যাতন আরও দৃঢ় করে দিল ব্রাউনের সংকল্পকে। তিনি এবং কয়েকজন বন্ধু জঙ্গল থেকে এসে লোক এবং টাকা সংগ্রহ করতে লাগলেন। যেখানে সুবিধা হ'ত, ক্রীতদাসদের সরিয়ে বাঁচিয়ে নিয়ে যেতেন। তিনি এতদিনে বুঝতে পারলেন যে, এমনি ক'রে তার শত্রুদের নিধন করা যাবে না, সমস্যারও সমাধান হবে না। তিনি নতুন কর্মপন্থা ঠিক ক'রলেন। তিনি গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য বন্ধুদের প্রবর্তিত করলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, এমন একটা কিছু করা দরকার যাতে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্র সজাগ হয়ে উঠে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়। তিনি ঠিক করলেন, যুক্তরাষ্ট্রের যে অস্ত্রাগার হারপার ফেরী ভারজিনিয়াতে আছে,

সেটিকে বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে করায়ত্ত করে দেশের সর্বত্র কালো ক্রীতদাসদের ডাক দিতে হবে—'এস, অস্ত্র ধর,—মুক্তির জন্য সংগ্রাম কর।' দু'একজন বন্ধু ব্রাউনকে বিরত করতে চেষ্টা ক'রলেন, কিন্তু ব্রাউনের দল তখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তারা গোপনে ছদ্মবেশে, ভিন্ন নামে, ছড়িয়ে পড়ল সেই সহরের চারিদিকে। সংখ্যায় তারা অল্প, কিন্তু সাহস ও শক্তিতে তারা দুর্জয়। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রিগুলি সাহায্য ক'রত তাদের আক্রমণের ব্যবস্থা করবার।

১৮৫৯ সালের ১৬ই অক্টোবর, রবিবারের নিশুতি রাত। চারিদিক নিস্তব্ধ। সহর কালো অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে। বাইশজন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর জনশূন্য রাস্তায় এসে চুপি চুপি নামল। তাদের মধ্যে পাঁচজন কালো ক্রীতদাস এবং সতের জন শ্বেতাঙ্গ বন্ধু। সকলের নেতা জন ব্রাউন। তাদের সঙ্গে একটি ঢাকা গাড়ী—যেন বহুদূর থেকে আসছে। গাড়ীর মধ্যে কিছু অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি। ব্রাউন তাঁর দুই সহচরকে পাঠালেন টেলিগ্রাফের তার কাটতে। অস্ত্রাগারের সঙ্গে সহরের সংযোগ ছিল একটা সেতু (ব্রীজ) দিয়ে। ব্রাউনের দল চক্ষের পলকে সেতুর উপর প্রহরীকে বন্দী করে নিল। নির্দেশ মত আলোগুলি নিবিয়ে দেওয়া হল। অন্ধকারে প্রায় বিনাবাধায় অতর্কিতে একের পর অন্য প্রহরীদের পরাস্ত করে বন্দী করা হ'ল। সেতুর উপর ব্রাউন দুই সহচরকে রাখলেন, যাতে বদলী প্রহরী

এলে সহজে বন্দী করা যায়। তারপর ব্রাউন সদলবলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে অস্ত্রাগারের দরজা ভেঙ্গে ফেললেন। বিশাল অস্ত্রাগার তাঁদের সহচরদের অধিকারে এসে যেতেই ব্রাউন তার কয়েকটি সহচরকে পাঠালেন অতর্কিতে নিকট ও দূরে কালো ক্রীতদাসদের মুক্ত ক'রে ডাক দিতে অস্ত্রাগারে আসার জন্যে। সমগ্র নগর তখনও ঘুমে অচেতন। রাত্রির শেষ প্রহরের জন্যে যে নতুন প্রহরী এল—সে তো দূর থেকে ব্যাপার দেখে অস্ত্রাগারের দিকেই আর গেল না। সোজা দৌড় দিল সহরের ভিতর ভয়ে চীৎকার করতে করতে। সহরের লোক আর মুষ্টিমেয় প্রহরীরা জেগে উঠল ; কিন্তু অজানা শত্রুর বিক্রম অনুমান করতে না পেরে আর অস্ত্রাগারের দিকে এল না। ব্রাউন অস্ত্রাগারের চারিদিকে তাঁর মুষ্টিমেয় সহচরদের সাজিয়ে রাখলেন, ক'জনকে পাঠালেন যে ট্রেন সকালে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে যাবে সেটাকে আটকাবার জন্যে। ট্রেন চলা বন্ধ করতে গিয়ে গোলমালে একটি বালক ক্রীতদাস গুলিতে নিহত হ'ল। এদিকে ব্রাউনের দল তখন এক অত্যাশ্চর্য কাজ করেছে। তারা দূর ও নিকট থেকে সহস্র সহস্র কালো ক্রীতদাস মুক্ত করে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আর বন্দী হয়ে এসেছে সাদা মালিকের দল। ব্রাউন উৎফুল্ল হ'য়ে তাঁর নতুন কালো বন্ধুদের সাদর-অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র দিলেন। ওয়াশিংটন অভিমুখী ট্রেনটি ছেড়ে দেওয়া হ'ল। কারণ ব্রাউন

মনে ক'রলেন যে এখন আর ট্রেন যাওয়া বা থাকার উপর তাঁর কিছুই নির্ভর করে না। কিন্তু এই ট্রেন যেতে দেওয়ার আদেশ তাঁর জীবনের মস্ত একটি ভুল। এই ভুলই তাঁর মহা সর্বনাশকে ডেকে আনল।

ট্রেনের যাত্রীরা লাইনের তু'পাশে কাগজে লিখে ফেলতে ফেলতে গেল ব্রাউনের ভীষণ অত্যাচারের সংবাদ এবং পরিশেষে ওয়াশিংটনে ব্রাউনের ভয়াবহ আক্রমণের খবর পৌঁছল।

এদিকে ব্রাউন তাঁর কালো বন্ধুদের ক্রমাগত আবেদন করছেন—'জাগ, ওঠ, স্বাধীনতা অর্জন কর, মানুষ হও।' ব্রাউন চিরকাল বিশ্বাস ক'রতেন এবং বলতেন 'ক্রীতদাসকে যদি স্বাধীন করতে চাও, তার হাতে অস্ত্র দাও।' কিন্তু আজ তাঁর সে বিশ্বাস ধূলিসাৎ হ'ল। যুগ যুগ হ'তে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থেকে আজ যখন সে শৃংখল ভাঙ্গল, তখন তারা নিজেদের মানুষ মনে করতে পারল না। ব্রাউন তাই তাদের কাছে মানুষের ব্যবহার পেলেন না। শৃংখলাবদ্ধ নির্জীব পশুর মত ভয় ও জড়তা তাদের অকর্মণ্য করে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে সাহস নেই, বুদ্ধি নেই, প্রতিশোধের স্পৃহা নেই, অস্ত্র-চালনায় ক্ষিপ্রতা নেই। তারা শৃংখলমুক্ত পশুর মত উদ্দেশ্যহীন ভাবে ইতস্তত ছড়িয়ে গেল। ব্রাউন কিন্তু তখনও হাল ছাড়েন নি।

দুপুর বেলা সাহসী সহরবাসীরা অস্ত্রাগার আক্রমণ ক'রল ; কিন্তু পরাস্ত হয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্রাউন আশা করলেন যে, তাঁর কালো বন্ধুরা জেগে উঠবে, এগিয়ে আসবে দৃঢ় পদক্ষেপে, বুকভরা সাহস আর বাহুতে অস্ত্র নিয়ে। কিন্তু তাঁর অশেষ চেষ্টাও নিষ্ফল হ'ল। সন্ধ্যার পূর্বে সংবাদ পেয়ে চার্লস নগর থেকে একশত সশস্ত্র সৈনিক এসে আক্রমণ ক'রল। ব্রাউন তাঁর মুষ্টিমেয় সহচরদের নিয়ে অস্ত্রাগারের উপর থেকে যুদ্ধ ক'রলেন। যুদ্ধে অনেক প্রিয় সহচর, এমন কি তাঁর পুত্রও প্রাণ হারাল। রাত্রিতে যুদ্ধ থামল। কিন্তু সমস্ত রাত্রি ধরে সরকারের তত্ত্বাবধানে টেলিগ্রাম ও ট্রেণের লাইন ঠিক হ'ল। আর সমস্ত রাত্রি ধরে ব্রাউন তাঁর পুত্র ও সহচরদের মৃতদেহের পাশে বসে রইলেন।

পরের দিন সকালে আরও নূতন সৈন্যবাহিনী এসে উপস্থিত হ'ল। ব্রাউন আর তাঁর দলের লোকদের পালাবার কোন পথ রইল না। আক্রমণ সুরু হ'ল। অস্ত্রাগার আক্রমণে কেঁপে উঠতে লাগল। ব্রাউনের দল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করল। প্রায় ২০০০ সশস্ত্র সৈন্য একসঙ্গে অস্ত্রগারে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়েছিল। ব্রাউন আর দু'জন সহচর জীবিত ছিলেন, কিন্তু গুলিতে সাংঘাতিকভাবে আহত অবস্থায় ধরা পড়লেন। গ্রেপ্তারের

পর ক্রোধান্ধ সেনানায়কের তরবারির আঘাতে তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

কিছুদিন পরে তাঁর এক ভূয়া বিচার হ'ল। বিচারের সময় তিনি আদালতে বলেছিলেনঃ 'আমি অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি, সংগ্রাম করেছি। আমার জীবনের পরম ব্রত ছিল আমার বন্ধুদের শৃংখল থেকে মুক্ত করা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা।' নভেম্বর মাসে বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হ'ল। পয়লা ডিসেম্বর সকাল ১০টায় প্রফুল্লচিত্তে তিনি মৃত্যুকে বরণ ক'রলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি হেসে বলেছিলেনঃ 'আমাকে হত্যা ক'রে আমার আদর্শকে হত্যা করতে পারবে না। আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না।'

জন ব্রাউনের কথা মিথ্যা হয় নি। পরবর্তী যুগে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস তার প্রমাণ। তাঁর বাণী সম্পূর্ণতা লাভ করতে এখনো দেরী আছে। যে সংগ্রামের তিনি প্রবর্তক ও প্রথম নায়ক, সে সংগ্রাম আজও যুক্তরাষ্ট্রে চলেছে। এ সংগ্রামের জয় ১৮৫৯ সালের ১৬ অক্টোবর নিশীথ রাত্রের অভিযাত্রীদের জয়।



তাতিয়া তোপী

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর মাঠে ভারতের যে ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটেছিল, ভারতবাসী তা কখনও ভুলতে পারেনি। বাংলার রাজা-জমিদার ও পরগণার মালিকদের বিশ্বাসঘাতকতার সেই গভীর কলঙ্করেখা ভারতের ললাট থেকে মুছে ফেলবার জন্যে ঠিক তার একশ' বছর পরে যে দুর্ধর্ষ প্রচেষ্টা হয়েছিল, ইতিহাসে তা 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে খ্যাত।

এ বিদ্রোহ এমন মারাত্মক হয়েছিল যে, ব্রিটিশের বিজয়-পতাকা বুঝি চিরদিনের জন্যে ভারত-সমুদ্রের অতল তলায় তলিয়ে

যাবে। কিন্তু তা হ'ল না। পলাশীর মত এখানেও সুবিধাবাদ আর সংকীর্ণ স্বার্থ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই দুর্ধর্ষ ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে বিদেশের অধীনতা অস্বীকারের যে দৃঢ় সংকল্প এবং তাকে কাজে পরিণত করতে গিয়ে যে বীরত্বের খ্যাতি ও ত্যাগের মহিমা বিচ্ছুরিত হয়েছিল, পৃথিবীর যে কোন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তা উল্লেখযোগ্য।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা বীরপুজা জানতেন না। আমাদের বাপ-মা ঘুম-পাড়ানী গানের ভিতর দিয়েও প্রাচীন বীরদের বীরত্বগাথা আমাদের মর্মগোচর করেন নি। তাই যাঁরা মহত্তর জীবন-সংগ্রাম সুরু করেছিলেন, তাঁদের আমরা ঠিক মনে রাখি নি। তোমরা যাতে ভুলে না যাও সেজন্যই বিস্মৃত ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁদের একজনের কাহিনী তোমাদের শোনাব। এই বীরের নাম তাতিয়া তোপী।

অসি ধরবার আগের দিনও এই বীরপুরুষের হাত ছিল মসী-মাখা। বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক নানা সাহেবের দরবারে ইনি ছিলেন একজন কেরানী। ছাইচাপা আগুনের অস্তিত্ব যেমন সাধারণত টের পাওয়া যায় না—তেমনি তাতিয়াও যে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মত আবশ্যক হলে তেতে উঠতে পারে, এও সকলের

জানা ছিল না। কিন্তু অনুকূল বাতাস যেমন ছাইটুকু সরিয়ে দিয়ে আগুনের অস্তিত্ব উদ্‌ঘাটিত করে, তেমনি বিদ্রোহের ঘূর্ণাবর্তও কলম কেড়ে নিয়ে তাতিয়ার হাতে বল্লম গুঁজে দিল।

এই ক্ষণজন্মা বীর ১৮১৪ সালে এক মারাঠা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাতিয়ার বাবা পাণ্ডুরঙ্গ ভট্ট শেষ পেশোয়া বাজিরাওর দান বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। বাজীরাও তাঁর শেষ জীবন কানপুরের নিকটে ব্রহ্মাবর্তে কাটিয়েছিলেন। নানা সাহেব এঁরই দত্তকপুত্র। তাতিয়া তোপী নানা সাহেবের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ছিলেন। বিদ্রোহের আরেকটি উজ্জ্বল রত্নও তাঁদের সাথী ছিল। এঁর নাম লক্ষ্মীবাঈ। এঁরা তিন জনে এক সঙ্গে খেলাধূলা করতেন। তখন কে জানতো যে, এরাই একদিন ইংরেজের বুকে শক্তিশেল হেনে তাদের শেষ করে দেবার আয়োজন করবে। ছেলেবেলায় রামায়ণ-মহাভারত এবং মারাঠাদের বীরত্বকাহিনী পড়ে এরা ভবিষ্যৎ জীবনের বনিয়াদ গড়ে তুলেছিলেন। বাজীরাও ইংরেজের নিমক খেয়েছিলেন কিন্তু এরা সে কলঙ্ক থেকেও মুক্ত ছিল।

১৮৫৭ সালের মে মাসে মীরাটের সেপাইরা সেখানকার ইংরেজদের ধ্বংস করে দিল্লীতে গিয়ে শেষ মোগলসম্রাট বাহাদুর

শা'কে স্বাধীন ভারতের সম্রাট্ বলে ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী বাংলা থেকে পেশোয়ার এবং দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র বিদ্রোহীরা ইংরেজের অবস্থা সঙ্গীন করে তোলে। এই বিরাট এলাকার প্রধান প্রধান শহরগুলিতে সেপাইরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে, বাহাদুর শা'র নামে শাসন-কার্য চালাতে থাকে। কিন্তু ইংরেজরাও নিষ্ক্রিয় ছিল না। প্রথমে পাঞ্জাবে বিদ্রোহীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে তারা দিল্লী অধিকার করে এবং মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশ থেকে সৈন্য আমদানী করে উত্তর ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিযুক্ত করে। এভাবে উভয় পক্ষে প্রবল সংগ্রাম সুরু হয়। এই সংগ্রাম প্রায় দু'বছর স্থায়ী হয়েছিল।

মীরাটের পতনের পর নানার নেতৃত্বে কানপুরও বিদ্রোহীদের দখলে আসে। ১৮৫৭ সালের মে মাসের শেষ দিকে এই ঘটনা ঘটে। ১৬ই জুলাই হ্যাভলকের নেতৃত্বে এক ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে বিদ্রোহীরা পরাজিত হলে নানা সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে ফতেপুর যান। এ দলে তাতিয়াও ছিলেন। এখানে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়। কিন্তু বিশেষ কিছুই স্থির হয় না। বিদ্রাহীদের মধ্যেও বিশৃংখলা ছিল। অথচ হাভলককে প্রতিরোধ করে কানপুর পুনরধিকারের

প্রয়োজন ছিল। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তাতিয়া মন্ত্রণা-সভার আলোচনা শুনছিলেন কিন্তু কিছুই বলছিলেন না। এ ভাবে কোন পরিকল্পনাই যখন স্থির হল না, তখন তিনি বললেন যে, বিশৃংখল বাহিনীকে সুশৃংখল ও সুনিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই বলে তিনি মন্ত্রণা-সভার নিকট এই দায়িত্ব পালনের অনুমতি চাইলেন। বলা বাহুল্য, সদস্যেরা সানন্দে সম্মতি দিলেন।

এদিকে হ্যাভলক কানপুর দখল করে লক্ষ্ণৌর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাতিয়া দেখলেন হ্যাভলককে গঙ্গাপার হতে দিলে লক্ষ্ণৌর বিদ্রোহীরা অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই একদিকে বিদ্রোহীদের সুশৃংখল করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেওরাজপুরের ৪২নং বাহিনীকে বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত করে তিনি কানপুরের দিকে এগিয়ে গেলেন। এ ভাবে পিছন থেকে আক্রান্ত হয়ে হ্যাভলক শুধু লক্ষ্ণৌ অভিযান স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেন না—তাতিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতেও বাধ্য হলেন। কিন্তু পরে আরও ব্রিটিশ সৈন্য এসে পড়ায় তাতিয়া পিছু হ'টে গঙ্গাপার হয়ে সদলবলে ফতেপুরে চলে গেলেন।

এই পরাজয়ে আবার আগের সমস্যা দেখা দিল ; সৈন্যাভাব, অর্থাভাব এবং সর্বোপরি বিশৃংখলা ও উৎসাহাভাব। নানা সাহেব উদ্বিগ্ন হলেন। কিন্তু তাতিয়া তাঁকে আশ্বস্ত করে সৈন্যসংগ্রহ

এবং একটা উপযুক্ত ঘাঁটি দখলের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রথমে ছদ্মবেশে গেলেন গোয়ালিয়রে। সেখানকার সমস্ত সৈন্য-বাহিনীকে হাত করে তার এক অংশকে সঙ্গে করে কল্পি পর্যন্ত নিয়ে এলেন। কল্পি যমুনার পারে। কানপুরের পর এখানকার ঘাঁটি সব দিক থেকে বিদ্রোহীদের পক্ষে সুবিধাজনক মনে ক'রে তাতিয়া কল্পির দুর্গ দখল করলেন। এ ভাবে বিদ্রোহীদের সুশৃংখল ক'রে তাতিয়া ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণ করবার জন্যে যমুনা পার হয়ে আবার কানপুরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কল্পি থেকে কানপুর ৪৬ মাইল। তাতিয়া সোজাসুজি কানপুর না গিয়ে তার আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম দখল করে সেনাপতি উইণ্ডহামের অপেক্ষায় রইলেন। ইংরেজ সেনাপতি ভেবেছিলেন, তাতিয়া কানপুরের দিকে আগাতে সাহস পাচ্ছে না,—এই মনে করে তিনি নিজেই আগিয়ে গেলেন বিদ্রোহীকে শাস্তি দেবার জন্যে। কিন্তু বেশীক্ষণ আর পারলেন না—তাতিয়া তোপীর তোপ যে বজ্রের মত তেড়ে আসবে, সেনাপতি উইণ্ডহাম তা ধারণা করতে পারেন নি। বেগতিক দেখে তিনি কানপুর দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। এ যুদ্ধে তাতিয়া কানপুরের অর্ধেক দখল করে ফেললেন। তাঁর সৈন্যদল ইংরেজের মত সুশিক্ষিত ও সুশৃংখল হ'লে এ যুদ্ধে তিনি গোটা

কানপুরই দখল করতে পারতেন। তথাপি তিনি অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে সক্রিয় হলেন! পরদিন সকালে আবার যুদ্ধ সুরু হ'ল। এ দিন ইংরেজ বাহিনীকে খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনে হল। কিন্তু দুপুরের পরই তাতিয়ার তোপ এমনভাবে গর্জে উঠল যে, তার অধিকাংশ সৈন্যই উড়ে গেল। এবার কানপুর সম্পূর্ণরূপে তাতিয়ার মুঠোর মধ্যে এল।

গঙ্গার ওপারে বসে স্যার কলিন্স কানপুরের বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি কানপুরের দিকে ছুটে এলেন। তাতিয়া অপ্রস্তুত ছিলেন না বটে, কিন্তু যুদ্ধে গোয়ালিয়র বাহিনী পিছু হটে গেল; ফলে, বিদ্রোহীদের এমন অবস্থা হ'ল যে, তারা বুঝি চারদিক থেকেই আট্‌কা পড়ে যাবে। কলিন্স সেভাবেই তাঁর সৈন্যদের চালনা ক'রে ছিলেন। কিন্তু তাতিয়া তাঁর দলবল ও সমরসম্ভার নিয়ে বৃটিশ বাহিনীর বৃত্ত ভেদ করে কল্পি চলে গেলেন—বৃটিশ-সেনাপতির পশ্চাদ্ধাবনই সার হ'ল।

কল্পিতে এসেই তাতিয়া শুনলেন—ঝাঁসি অবরুদ্ধ। তাঁর মনে পড়ল মনুবাঈকে—তাঁর ছেলেবেলার খেলার সাথীকে। তাতিয়া দ্রুতগতিতে আগিয়ে গেলেন রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের সাহায্যার্থে ঝাঁসির দিকে। তাতিয়ার সঙ্গে এবার ২২ হাজার সৈন্য ছিল। ইংরেজ সেনাপতি স্যার হিউ রোজ দুদিক থেকে আক্রান্ত

হওয়ার আশংকায় চিন্তিত হলেন বটে, কিন্তু ধৈর্য ও বুদ্ধি কোনটাই হারালেন না। উপায়ান্তর না দেখে তিনি তাতিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁসির বাহিনীর উপরেও গোলাবর্ষণ সুরু করলেন। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হলেন। তাতিয়ার সৈন্যদল যেন জড়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। তাতিয়া অগত্যা পিছু হটে গেলেন। শুধু তাই নয়—তাঁর বহু সৈন্য মরে গেল এবং অনেক রসদ ও রণসম্ভার শত্রুর হাতে পড়ল। রাণী লক্ষ্মীবাঈ এ সংবাদ শুনে দুঃখিত হলেন বটে, কিন্তু কাতর হলেন না। তিনি পুরুষের বেশে যুদ্ধ করতে করতে অবরোধ কেটে বেরিয়ে গেলেন।

এ দিকে তাতিয়া কল্পিতে ফিরে না গিয়ে, গেলেন গোয়ালিয়রে তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করতে। ঝাঁসির বিপর্যয়ে তিনি বুঝেছিলেন, নতুন করে সৈন্যবাহিনী গঠন করতে না পারলে, তাদের ভিতর শৃংখলা ও উৎসাহ সঞ্চার করতে না পারলে, নতুন নতুন এলাকায় বিদ্রোহ না ছড়াতে পারলে বিদ্রোহের প্রচেষ্টা একেবারেই পণ্ড হয়ে যাবে। তাই তিনি গেলেন তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করতে নতুন প্রচেষ্টার আয়োজনে।

এই অবসরে স্যার হিউ রোজ রাণী লক্ষ্মীবাঈ, পেশোয়া এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের হারিয়ে দিয়ে কল্পি দখল করে

ফেললেন। এই পরাজয়ে বিদ্রোহীদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল। তাদের এখন না রইল দুর্গ, না রইল সৈন্য, না রইল নতুন আয়োজনের আশা। তারা হতাশ হয়ে পড়ল। তাতিয়া এ দুর্দৈব আগেই আশংকা করেছিলেন এবং এ জন্য তিনি গোয়ালিয়রে গিয়েছিলেন। তাঁর এই যাওয়া ব্যর্থ হয় নি—গোয়ালিয়রবাহিনী কৌশলে বশীভূত করে তিনি বিদ্রোহীদের আড্ডায় ফিরে এলেন। আবার স্থরু হ'ল আয়োজন, আবার পড়ে গেল সাজ-সাজ রব। বিদ্রোহী বাহিনী অবিলম্বে গোয়ালিয়র আক্রমণ করলেন। জয়জীরাও সিন্ধিয়া বাধা দিলেন বটে, কিন্তু যখন দেখলেন যে, তাঁর দরবার ও সৈন্যবাহিনী তাতিয়ার কথায় উঠছে বসছে, তখন আর তিনি বীরত্ব দেখাতে সাহস করলেন না—মন্ত্রীকে সঙ্গে করে আগ্রায় পালিয়ে গেলেন।

গোয়ালিয়রে বিদ্রোহীদের পতাকা উড়তে লাগল। কিন্তু তা'ও বেশী দিন নয়। স্যার হিউ রোজ প্রচণ্ড বিক্রমে এসে গোয়ালিয়রের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ যুদ্ধে রাণী লক্ষ্মীবাঈ আশ্চর্য সাহস ও বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, কিন্তু সকল বীরত্বই ব্যর্থ হ'ল—বিদ্রোহীরা পরাজিত হ'ল। রাণী লক্ষ্মীবাঈ সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। আর তাতিয়া ?

বৃটিশের শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তিনি কোথায় অদৃশ্য হলেন? বৃটিশ কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে, স্যার হিউ রোজ অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তবে এখন তাঁদের দুশ্চিন্তার বেশী কারণ ছিল না। কারণ, উত্তর ভারতের বিদ্রোহ সম্পূর্ণই দমিত হয়েছিল। বিহারে কুমার সিং মৃত, তাঁর সুযোগ্য সহোদর অমর সিংহ উধাও, অযোধ্যাবীর মৌলবী আহম্মদ শা' বিশ্বাসঘাতকের গুলিতে নিহত, রাণী লক্ষ্মীবাঈ মৃত, নানা সাহেব পলাতক, রোহিলখন্দের খানবাহাদুরও নেই; সুতরাং বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এবার তাতিয়া, পেশোয়া ও বাহাদুর শা'র ছেলে, প্রিন্স ফিরোজ শা'কে ধরবার জন্যে চারিদিক থেকে জাল বিস্তার করল। তারা ঠিক করল—কিছুতেই তাতিয়াকে নর্মদা নদী পার হতে দিবে না। তাদের আশংকা ছিল, তাতিয়া মহারাষ্ট্রে পা দিলে সমস্ত বোম্বাই প্রদেশ চঞ্চল হয়ে উঠবে। সুতরাং বৃটিশের সমগ্র শক্তি এই 'মারাঠা বাঘকে' ধরবার জন্যে নিযুক্ত হ'ল। কিন্তু তাতিয়া তোপী ইংরেজের সর্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে গিয়ে যে বুদ্ধি-কৌশল ও ক্ষিপ্রতা দেখিয়েছিলেন, তা কল্পনাতে ও আনা যায় না।

ধরা না দিয়ে তাতিয়া সম্মুখ যুদ্ধ হতে দূরে থেকে গেরিলা নীতি অবলম্বন করেছিলেন। এভাবে পূরা দশ মাস বৃটিশের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে যখন তিনি এক জায়গায় বিশ্রামার্থ নিদ্রা

যাচ্ছিলেন, তখন মানসিংহ নামক একজন বিদ্রোহী তাঁকে ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ ক'রে দেয়। তাতিয়ার এই দশ মাসের কার্যকলাপ সম্পর্কে ইংলণ্ডের বিখ্যাত পত্রিকা 'টাইমস'এ নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশিত (১৭ই জানুয়ারী, ১৮৫৯) হয়েছিল :

"আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু—তাতিয়া, আমাদের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়েছেন। তাঁর মত চতুর শত্রুকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। গত জুন থেকে তিনি সমগ্র মধ্য ভারতকে উত্তপ্ত রেখেছেন। তিনি ঘাঁটির পর ঘাঁটি ধ্বংস করেছেন, অজস্র কোষাগার, অস্ত্রাগার লুঠ করেছেন ; সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেছেন, হারিয়েছেন ; যুদ্ধ করেছেন, হেরেছেন ; দেশীয় রাজাদের নিকট থেকে কামান ছিনিয়ে এনেছেন, হারিয়েছেন ; আবার সংগ্রহ করেছেন, আবার হারিয়েছেন ; এভাবে বিদ্যুৎ গতিতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ দৈনিক ত্রিশ থেকে চল্লিশ মাইল বেগে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়েছেন ; তিনি এখানে-সেখানে নানা জায়গায় নর্মদা পার হয়েছেন কখনও আমাদের বাহিনীর সুমুখ দিয়ে, কখনও পিছন দিয়ে, কখনও ভিতর দিয়ে ; এঁর চেয়ে *এরিয়েল বেশী ক্ষিপ্রগতি ছিল না…। কখনও পাহাড়, কখনও নদী, কখনও

*এরিয়েল (Ariel) অমর কবি সেক্ষপীয়র-রচিত বিখ্যাত নাটক "টেম্পেষ্ট" এর একটিচরিত্র।

পার্বত্য সরু পথ, কখনও উপত্যকা, কখনও জলাভূমি পার হয়ে তিনি চলেছেন···।”

আর একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন ঃ

“...তাতিয়ার এই বিস্ময়কর পশ্চাদপসরণ পরাজয়কেও লজ্জা দিচ্ছিল। এ সব কারণে ইংরেজ সেনাপতিদের চেয়ে তাঁর নামই ইউরোপে বেশী পরিচিত হ'ল। তাঁর সমস্যা সহজ ছিল না। বিশৃংখল, পরাজিত ও ভীত একটি বাহিনীকে তাঁর সুশৃংখল রাখতে হয়েছিল। এই বাহিনীর সংগে তাঁর কোন বাধ্য-বাধকতার সম্পর্ক ছিল না। এই অদ্ভুত বাহিনীকে তিনি সর্বদার জন্যে এমন দ্রুতগতির মধ্যে রেখেছিলেন যে, তাঁর সমস্ত অনুসরণকারীরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে আবার তিনি সহরের পর সহর দখল করেছেন—কামান, রসদ ও সৈন্য সংগ্রহ করেছেন। এভাবে যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে, প্রত্যহ ষাট মাইল ক'রে দৌড়ে পালাতে হবে—এ জেনেই তারা যোগ দিয়েছে, যে অদ্ভুত কর্মদক্ষতা দ্বারা তিনি এসব করেছেন, তা সাধারণ স্তরের নয়। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে তাঁকে হায়দার আলীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। তিনি যদি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী নাগপুরের ভিতর দিয়ে মান্দ্রাজে পৌঁছাতে পারতেন, তা'হলে হায়দর আলীর মতই দুর্ধর্ষ হতে পারতেন।·”

এই দশ মাস তাতিয়া ঠিক যাদুকরের মতই বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে বোকা বানিয়ে দিয়েছিলেন।

১৮৫৯ সালের ১৮ই এপ্রিল বিকাল ৪টার সময় তাতিয়ার ফাঁসি হয়। ফাঁসির হুকুম শুনে তিনি এতটুকু দুঃখ প্রকাশ করেন নি। নিজেই মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘাতকগণ তার হাত-পা বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করলে, তিনি বললেন—"এসবের দরকার নেই।" এই বলে তিনি নিজেই ফাঁসির দড়িটা গলায় ঝুলিয়ে দিলেন।

এ ভাবে অমন পরাক্রান্ত বিদ্রোহের পরিণতি হবে তা তাদের কেউ আশা করে নি। কিন্তু তারা এ কথা জানত যে, "অজ্ঞানের বলি চিরদিন এমনি করেই আদায় হয়।"



ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

ফ্রান্সের যেমন যোয়ান অব আর্ক, ভারতের তেমনি ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। ১৮৫৭ সালের বীরযজ্ঞে অসংখ্য সেপাই যোদ্ধা আত্মাহুতি দিয়েছিল, অসংখ্য রাজা-জমিদার চরম ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করেছিল, অসংখ্য লোক সাহস ও বীরত্বের চরম পরিচয় দিয়েছিল, সৈন্য-পরিচালনা ও যুদ্ধে অসংখ্য লোক আশ্চর্য কৌশল দেখিয়েছিল; কিন্তু

কর্তব্যনিষ্ঠা ও সাহসিকতায় রাণী লক্ষ্মীবাঈর সমতুল্য খুব কমই দেখা গিয়েছিল। জনৈক ইংরেজ লেখক বলেছেন যে, বিদ্রোহীদের মধ্যে মৌলবী আহম্মদ শা, কুমার সিং, তাতিয়া তোপী এবং রাণী লক্ষ্মীবাঈর মত আর দু'চার জন থাকলে ভারতের ইতিহাস ভিন্নরূপ হ'ত। স্যার হিউ রোজ বলেছেন, "বিদ্রোহীদের মধ্যে রাণী লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন সব চেয়ে সাহসী ও শ্রেষ্ঠ।"

ইংরেজ সেনাপতি অতিশয়োক্তি করেন নি। বস্তুত, লক্ষ্মীবাঈ যে আশ্চর্য সাহস, অটুট সংকল্প, অপূর্ব নিষ্ঠা ও বলবীর্য প্রদর্শন করেছিলেন, স্যার হিউ রোজ তা শুধু নিজের চোখেই দেখেন নি, তাঁকে পরাস্ত করার গৌরবও তিনি অর্জন করেছিলেন।

"মেরি ঝাঁসী দেউঙ্গী নেহি", এ শুধু কয়েকটি শব্দের সমষ্টি নয় —শুধু ঘোষণা নয়—এ একেবারে 'চ্যালেঞ্জ'! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রুশিয়া জার্মেণীকে এরূপ 'চ্যালেঞ্জ'ই করেছিল। তাদের 'চ্যালেঞ্জ' জয়যুক্ত হয়েছিল, কিন্তু লক্ষ্মীবাঈএর হয় নি; তবুও যে কীর্তি তিনি রেখে গেছেন, তা কোন দিনই ম্লান হবার নয়। আমাদের নিরবচ্ছিন্ন নির্বীর্যতা ও কাপুরুষতার অন্ধকার আকাশে তা চিরদিনই উজ্জ্বল তারকার মত দীপ্ত থাকবে।

এই মহীয়সী বীর রমণী ১৮৩৫ সালে কাশীতে এক মারাঠা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এর বাবার নাম মোরোপন্থ তাম্বে

এবং মায়ের নাম ভাগীরথী বাঈ। লক্ষ্মীবাঈর ছেলেবেলার নাম মনুবাঈ। মনুর বয়স যখন তিন কি চার বছর, তখন মোরোপন্থ সপরিবারে কানপুরের নিকটে বিথুরে আসেন। এখানে পেশোয়া বংশের দ্বিতীয় বাজিরাও গদী হারিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পেন্‌সন ভোগ করছিলেন। বাজিরাও সাগ্রহে এই ব্রাহ্মণ পরিবারকে আশ্রয় দিলেন।

মনু ছেলেবেলায় ছিলেন একটি ফুটন্ত গোলাপের মত। অল্প দিনের মধ্যেই মনু সকলের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বাজিরাওয়ের দরবারের লোক আদর করে তাঁর নাম দিল 'চামেলী'। নানাসাহেব ছিলেন বাজিরাওয়ের দত্তক পুত্র এবং এঁর অন্তরঙ্গ ছিলেন তাতিয়া তোপী। মনু এঁদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন; কিন্তু পড়াশুনা ও খেলাধূলা করতেন একসঙ্গে। খেলাধূলার মধ্যে অসি-চালনা ও অশ্ব-চালনাও ছিল। এঁরা যখন অসিচালনা শিখতেন কিংবা কটিতে কৃপাণ ঝুলিয়ে অশ্বারোহণে বেরুতেন, তখন কি কেউ ধারণা করতে পেরেছিল যে, মারাঠার লুপ্ত শক্তি এঁদের মারফত ভারতবর্ষে আরেকবার চমক দিয়ে যাবে?

এক একদিন বড় সুন্দর দৃশ্য দেখা যেত। নানা সাহেব হয়ত হাতীতে চড়ে কেবল বেড়াতে বেরিয়েছে—দেখা গেল, তরবারি

ঘুরিয়ে দূর থেকে দৌড়ে আসছে মনু—হাঁপাতে হাঁপাতে হাতীর কাছে এসে নানাকে বলছে, "আমাকে নিয়ে যাবে না?" এভাবে গড়ে উঠছিল মারাঠা-শক্তির শেষ প্রতিনিধিদের জীবন।

সাত বছর বয়সে মনুর বিয়ে হ'ল ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধর রাও বাবা সাহেবের সাথে। এখন আর মনু বিথুরের ছোট্ট ফুটফুটে আনন্দ-ঝর্ণা নয়—নানা-তাতিয়ার খেলার সাথী নয়—এখন মনু গঙ্গাধর রাও'র মহিষী ও ঝাঁসীর মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ। স্বামীর ঘরে এসেও তিনি সকলের হৃদয় জয় করলেন। তাঁর ব্যবহারে ঝাঁসীর দরবার মুগ্ধ হ'ল। কিন্তু সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্ভোগ তাঁর বিধি-লিপি নয়—তাই একমাত্র ছেলে মারা যাওয়ার কিছুদিন পরেই তাঁকে সীমন্তের সিন্দুরও মুছে ফেলতে হ'ল—১৮৫৩ সালে অপুত্রক অবস্থায় গঙ্গাধর রাওর মৃত্যু হ'ল। লক্ষ্মীবাঈয়ের বয়স তখন আঠারো বছর। মৃত্যুর পূর্বে গঙ্গাধর রাও অবশ্য এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেছিলেন—তাঁর নাম দামোদর রাও।

পর পর এরূপ নিদারুণ আঘাত সামলিয়ে উঠতে না উঠতেই লক্ষ্মীবাঈ আর একটি আঘাত পেলেন। এবার অবশ্য যমরাজের নয়, কিন্তু তার চাইতেও হিসেবী, বৃটিশরাজের। দত্তক পুত্রের

রাজা হওয়ার অধিকার নেই—এই ওজুহাতে বড়লাট লর্ড ডালহৌসী ঝাঁসীর রাজ্য কেড়ে নিলেন। লক্ষ্মীবাঈ তাতে দমলেন না—প্রতিনিধি পাঠিয়ে বড়লাটের নিকট তিনি অনেক আবেদন জানালেন রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে, দত্তক পুত্র দামোদরকে উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার জন্যে ; কিন্তু সকল আবেদনই তাঁর ব্যর্থ হ'ল। তখন ক্ষাত্রনারীর তেজে তিনি রাজ-প্রতিনিধিকে জানিয়ে দিলেন : 'মেরী ঝাঁসি দেউঙ্গী নেহি'।

ওদিকে নানা সাহেবও দ্বিতীয় বাজিরাওর মৃত্যুর পর পেন্সন থেকে বঞ্চিত হলেন। তিনিও বিলাতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে বহু দরবার করেছিলেন কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। লর্ড ডালহৌসীর রাজ্যগ্রাস নীতি অটুট রয়ে গেল। শুধু এদের সম্পর্কেই যে সরকার এরূপ নীতি অবলম্বন করেছিলেন, তা নয়—এ ছিল দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সরকারের সাধারণ নীতি। এই কারণে রাজ্যচ্যুত ও পেন্সনহারা রাজা-মহারাজারা বৃটিশ সরকারের প্রতি ক্ষোভও রোষ পোষণ করতে লাগলেন। সরকারের উপরে ভারতীয় সেপাইরাও এ সময় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। শেষ মোগল সম্রাট্ বাহাদুর শাকে সামনে রেখে নানা সাহেব, অযোধ্যার নবাব, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, মৌলবী আহম্মদ শা প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ গোপনে সেপাইদের

ভিতরে এবং অন্যান্য দেশীয় রাজাদের মধ্যে বিদ্রোহের সঞ্চার ও প্রচার করতে সুরু করলেন। সর্বত্র এক সময়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের একটা দিনও ধার্য করা হ'ল, কিন্তু তার আগেই সুরু হয়ে গেল বাংলায়। দেখতে দেখতে সমগ্র উত্তর-ভারতে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

লক্ষীবাঈ এ সুযোগ ছাড়লেন না। তাঁর নেতৃত্বে ঝাঁসির সেপাইরা ঝাঁসি থেকে ইংরেজ রাজত্ব মুছে দিল। লক্ষীবাঈ স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যের সর্বত্র শৃংখলা স্থাপন করলেন। টাঁকশাল প্রতিষ্ঠান, দুর্গ নির্মাণ, সৈন্য সংগ্রহ—এ ছাড়া চারিদিকে বিদ্রোহের ভাব যাতে দ্রুত দানা বেঁধে ওঠে, এরূপ সকল দিকেই তিনি আশ্চর্য তৎপরতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিলেন। এ সময়ে তাঁর বয়স বাইশ। তিনি প্রায়ই পুরুষের বেশে দরবারে এসে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। কখনো কখনো যোদ্ধৃবেশেও আসতেন। সব চেয়ে চমৎকার লাগত যখন তিনি পায়ে পায়জামা, গায়ে আঙরাখা, মাথায় টুপী পরে এবং কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে বাইরে বেরুতেন প্রজার সুখদুঃখের খবর নিতে। প্রজাদের মন তখন আশা ও আনন্দে ভরে উঠত। তাদের জন্য তাঁর দরদেরও সীমা ছিল না। একদিনের একটি ঘটনা তোমাদের বলি।

লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন মহালক্ষ্মীর উপাসিকা। একটা হ্রদের তীরে অবস্থিত ছিল এই দেবীর মন্দির। তিনি এখানে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে পূজা দিতে আসতেন। একদিন তিনি মন্দির থেকে ফিরছেন, এমন সময় নগরের দক্ষিণ দেউরীতে একটা গোলমাল শুনে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, অনেক ভিক্ষুক রাণীজীর নিকট শীতবস্ত্রের আবেদন জানাতে এসেছে—তাই এই গোলমাল। ভিক্ষুকের সংখ্যা হাজার হাজার। লক্ষ্মীবাঈর দরদী হৃদয় এই দুঃখের কথা শুনে গলে গেল। তিনি অবিলম্বে নগরের সমস্ত দর্জিকে শীত নিবারণের উপযোগী বস্ত্রাদি তৈরী করে দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুকদের জানিয়ে দিলেন নির্দিষ্ট দিনে এসে সে সব নিয়ে যেতে। এই সঙ্গে যারা ভিক্ষুক নয়—অথচ গরীব, নির্দিষ্ট দিনে তাদেরও তিনি কাপড়-চোপড় দিয়ে সাহায্য করবেন বলে জানিয়ে দিলেন। সন্তানহীনা লক্ষ্মীবাঈএর মাতৃমমতা পেয়েছিল সমস্ত দীন দুঃখী প্রজারা।

এভাবে বীর্যবতী ও দয়াময়ী রাণী লক্ষ্মীবাঈ দশ মাস কাল রাজত্ব করতে না করতেই নগরের বাইরে বেজে উঠল ইংরেজের রণভেরী।

সুদক্ষ সেনাপতি স্যার হিউ রোজ এলেন ইংরেজ বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে। লক্ষ্মীবাঈ এ সংবাদ পেয়েই তাতিয়া তোপীর সাহায্য চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। তাতিয়া তোপী বহু সৈন্য নিয়ে এলেন

বটে, কিন্তু স্যার হিউ রোজের নিকট পরাভূত হয়ে হ'টে গেলেন—এবং ঝাঁসিরও পতন হল; কিন্তু সহজে নয়। লক্ষ্মীবাঈর আহ্বানে ঝাঁসির সমস্ত সর্দার, পরিণত বয়সের সমস্ত পুরুষ-নারী, এমন কি বালকবালিকারাও পর্যন্ত দুর্গরক্ষার জন্যে এগিয়ে এল। দশ-বারো দিন পর্যন্ত তারা আশ্চর্য সাহস, সহিষ্ণুতা ও দুর্জয় সংকল্প নিয়ে যুদ্ধ করল। কিন্তু দুর্গরক্ষা করা সম্ভব হল না। ঝাঁসির দুর্গে আবার ইংরেজ পতাকা উড়তে লাগল।

দুর্গ পতনের পর রাণী লক্ষ্মীবাঈ সর্দারদের পরামর্শে ঘোড়ায় চড়ে পুত্র দামোদরকে কাপড় দিয়ে নিজের পিঠে বেঁধে নিয়ে পুরুষবেশে পনেরো কি বিশ জন সৈন্যসহ রাতের অন্ধকারে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গেলেন। এভাবে পূরা একদিন প্রায় অনবরত ঘোড়া চালিয়ে পরদিন দুপুর রাতে তিনি কল্পিতে পৌঁছলেন। কিন্তু তাও নিরাপদে নয়। লেফটেনান্ট বাওকার শিক্ষিত অশ্বারোহী নিয়ে রাণীকে ধরবার জন্যে পিছু নিয়েছিলেন। যুদ্ধে বাওকার আহত হয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু যে ঘোড়াটি রাণীকে প্রায় একটানা একশত ছ'মাইল পিঠে করে নিয়ে কল্পিতে পৌঁছিয়ে দিল, সে ঘোড়াটি আর বাঁচল না। ঘোড়াটি রাণীর খুব প্রিয় ছিল।

কল্পিতে এসে লক্ষ্মীবাঈ আবার কাজ আরম্ভ করে দিলেন। সৈন্যসংগ্রহে মন দিলেন, নিরুৎসাহ বিদ্রোহীদের মধ্যে আশা ও উৎসাহ সঞ্চার করলেন। তাতিয়ার চেষ্টায় গোয়ালিয়রের দরবার

বিশেষ করে, সৈন্যবাহিনীর সহায়তা পাওয়া গেল। এদিকে উত্তর-ভারতের বিদ্রোহ দমিত হয়ে যাওয়ায় কল্পিও আর নিরাপদ ছিল না। সুতরাং গোয়ালিয়রকে ঘাঁটি করতে পারলে সমগ্র মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহের আগুন দ্রুত প্রজ্জ্বলিত করা সম্ভব হবে মনে করে তাতিয়া তোপী, রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও অন্যান্য নেতৃবর্গ দ্রুত গোয়ালিয়র দখল করলেন।

ওদিকে স্যার হিউ রোজও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তিনিও বহু সৈন্য নিয়ে গোয়ালিয়র আক্রমণ করলেন। কয়েকদিন পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। কিন্তু অসাধারণ বীরত্ব ও রণকৌশল দেখিয়েও শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা জয়ী হতে পারল না।

যুদ্ধের শেষদিন লক্ষ্মীবাঈ উদয়াস্ত পুরুষবেশে ঘোড়ায় চেপে সৈন্যদের উৎসাহ দিতে দিতে যুদ্ধ করেছিলেন। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে তিনি চারিদিকে থেকে আক্রান্ত হলেন। কিন্তু তথাপি সেই অগ্নিবৃত্ত ভেদ করে যখন তিনি বেরিয়ে যাবেন তখন এক নারী-কণ্ঠের আর্ত চীৎকারে তিনি আবার ফিরে দাঁড়ালেন—দেখলেন, তাঁরই একজন পুরুষবেশী সঙ্গিনীকে একজন ইংরেজ সৈন্য গুলি করে মেরে ফেলেছে। লক্ষ্মীবাঈ ক্ষেপে গিয়ে সেই গোরা সৈন্যটিকে তরবারীর এক আঘাতেই ধরাশায়ী করে দিলেন। এর পর তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। ইংরেজ সৈন্যও তাঁর পিছু ছাড়ল না। কিছুদূর গিয়ে রাণী একটা খালের নিকটে এলেন ;

কিন্তু ঘোড়াটা লাফ দিল না। মাত্র একটি লাফ—একটি লাফ দিলেই রাণী ইংরেজের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারেন ; কিন্তু ঘোড়াটা তাঁর নিজের শিক্ষিত ঘোড়া নয়—সেটি ক্লান্ত হয়ে পড়াতে রাণী আরেকটা ঘোড়া বেছে নিয়েছিলেন। এখন এই ঘোড়াটাই তাঁর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াল। রাণী অনেক চেষ্টা করলেন খালটা পার হতে কিন্তু ঘোড়াটা দাঁড়িয়েই রইল—এক কদমও এগোলো না। এর মধ্যেই পশ্চাদ্ধাবক ইংরেজ সৈন্যরা এসে তাঁকে আক্রমণ করল। রাণীর সঙ্গে আর কেউ ছিল না। একাই তিনি দাঁড়ালেন সকলের বিরুদ্ধে অসি নিয়ে। তারা চারদিক থেকে রাণীকে আক্রমণ করল—কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে মাথায় আঘাত লেগে তিনি পড়ে গেলেন। দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। তবুও তিনি ছাড়লেন না—শেষবারের মত রুখে উঠে আঘাতকারীকে আক্রমণ করে তাকে নিহত করলেন। রাণীর শেষ নিঃশ্বাস পড়তে তখন খুব অল্প সময়ই বাকী ছিল। রামচন্দ্ররাও দেশমুখ নামে একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য তখন নিকটেই ছিল। সে রাণীকে নিকটস্থ একটি পর্ণকুটীরে নিয়ে যায় এবং সেখানেই এ বীর রমণীর প্রাণস্পন্দন চিরদিনের মত থেমে যায়।

এ ভাবে যুদ্ধ করে. বীরের মৃত্যু বরণ করে বীরাঙ্গনা লক্ষীবাঈ ইতিহাসের পাতায় আপনার নাম উজ্জ্বল করে গেছেন।



আজ থেকে প্রায় ৫৬ বছর আগের কথা। ইতালীর কাপেরা সহরে এক বৃদ্ধ তাঁর শুশ্রূষাকারীদের একদিন অনুরোধ করলেন তাঁর সামনের মস্ত বড় জানালাটিকে খুলে দিতে। জানালা খুলে, দেওয়া হল, অনেকটা আলো ও বাতাস ঘরে এল। বৃদ্ধের বয়স পঁচাত্তর, দেখতে প্রসন্নশ্রী, শান্ত ও সৌম্য। কঠিন পরিশ্রম ও সংযমের ছাপ তাঁর প্রতি অঙ্গে। তিনি অপলক চক্ষে উন্মুক্ত জানালার বাইরে চেয়ে রইলেন; তাঁর ক্লান্ত ও দুর্বল দৃষ্টিতে ফুটে উঠ্‌ল আনন্দ ও তৃপ্তির রেখা। তিনি তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব ও উপভোগ করছিলেন বাইরের পৃথিবীকে, তাঁর ইতালীকে, ইতালীর আলো, বাতাস, সবুজ গাছ ও মাঠ, নীল

আকাশ ও দুর্দান্ত সমুদ্রকে। মৃত্যু নিঃশব্দে তাঁর চোখে নেমে এল, তিনি চোখ বন্ধ করলেন। ঘরের লোক নিরুপায় হয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তিনি লোকান্তরে যাত্রা করলেন। ইনি ছিলেন ইতালীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীর পুত্র জোসেফ গ্যারিবল্ডী। জোসেফ গ্যারিবল্ডী ইতালীর ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম আর আত্মত্যাগ করে গেছেন, তা নিষ্কাম ও অসামান্য বীর ধর্মের দৃষ্টান্তস্বরূপ, পৃথিবীর ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে আছে ও থাকবে।

এই আদর্শবাদী, স্বাধীনতার পূজারী ১৮০৭ সালে ৪ঠা জুলাই নাইসের এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ডোমেনিকো গ্যারিবল্ডীর একখানা জাহাজ ছিল। তার সাহায্যে তিনি সমুদ্রের উপকূলভাগে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা তাঁর মোটেই ভাল ছিল না। ছেলেকে তিনি অনেক ভেবে স্কুলে দিলেন। কিন্তু নিয়মিত স্কুলে যাতায়াতের চেয়ে পাহাড়ে শিকার করা আর সমুদ্রে মাছধরায় তাঁর ছিল বেশী উৎসাহ। তা বলে গ্যারিবল্ডা মূর্খ ছিলেন না। পরিণত বয়সে তিনি দু'খানা উপন্যাস ও নিজের জীবন-চরিত লিখেছিলেন। ছেলেবেলা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

"নিয়মিত স্কুল-জীবন ও স্বগৃহে বন্দিদশার চিন্তায় আমি হাঁপিয়ে উঠ্লাম। একদিন কয়েকজন সমবয়সীকে বললাম : "চল আমরা

জেনোয়ায় পালিয়ে গিয়ে রোজগারের চেষ্টা করি। এই ঠিক করে আমরা একখানি নৌকা যোগাড় করে পূবদিকে রওনা হলাম। কিন্তু কিছুদূর যাবার পর বাবার প্রেরিত একখানা ছোট জাহাজ আমাদের ধরে ফেল্‌ল। ফিরে আসতে বাধ্য হলাম।"

গ্যারিবল্‌ডীর বয়স তখন পনেরো মাত্র। ডোমেনিকো ছেলের মতিগতি বুঝে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে নাবিকের কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। গ্যারিবল্‌ডী চব্বিশ বছর বয়সে পাকা নাবিক হয়ে ক্যাপ্টেনের পদ লাভ করলেন। এই কাজের সূত্রে একবার তিনি রোমে গিয়েছিলেন। তাঁর জাহাজখানা টাইবার নদীর মুখে নোঙর করেছিল। ইতালীর প্রাচীন গৌরবের স্মৃতিমণ্ডিত রোম নগরী দেখে গ্যারিবল্‌ডীর তরুণ মন এক অপূর্ব ভাবাবেগে তরংগিত হয়ে উঠ্‌ল। তিনি রোমকে দেখলেন ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ইতালীর কেন্দ্ররূপে। খণ্ড, ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ইতালীকে একরাজকতা পাশে বেঁধে দেওয়ার আকাংক্ষা তাঁর মনে দুর্বার হয়ে উঠল।

প্রাচীন রোমসাম্রাজ্যের পতনের পরে ইতালীয়দের দুঃখের সীমা ছিল না। উত্তরে অষ্ট্রিয়া, দক্ষিণে স্পেন ও ভিতর হ'তে পোপ,—অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি ও ব্যাভিচারের শত বাহু বিস্তার ক'রে ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থানকে ভাগাভাগি করে

ভোগ করছিল। এদের অত্যাচারের মৃদুতম প্রতিবাদও বে-আইনী ছিল। এঁদের মধ্যে পোপের শাসনই ছিল সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল। এই বিভক্ত ইতালী যে কোনদিন আবার তার পূর্ব গৌরব নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে—এ আশা ইতালীর জনসাধারণ একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ফ্রান্সের বিপ্লবী বাহিনী যেদিন ইতালীতে পদার্পণ করল, সেদিন থেকে ইতালীর জনসাধারণ দেখতে লাগল আঁধারে আলো। কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর আবার পুরানো ব্যবস্থা কায়েম হ'ল। এবার আরও কঠোর—আরও ক্রূর—আরও নির্মম। কিন্তু—

একবার যে আগুন জ্বলেছে শত অত্যাচারও সে আগুন নিভাতে পারে না—না জ্বল্‌তে পারলেও ছাইচাপা থাকে; ন্যায়ের দণ্ড অন্যায়ের উদ্ধত আস্ফালনকে দণ্ড দিবেই। নইলে মানুষের গতি কি হবে? সে এগোবে কি করে? এই ন্যায়ের দণ্ড ধারণ করেছিলেন ইতালীর তিনজন লোক। এঁদের নাম—ম্যাট্‌সিনী, গ্যারিবল্‌ডী আর কাভুর। এঁদের মিলিত চেষ্টার ফলেই ইতালী স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ হয়; অথচ এঁদের কজের ধারা ছিল আলাদা। ইতালীয়দের মধ্যে প্রথমে ম্যাট্‌সিনীই স্বাধীনতার আকাংক্ষা জাগিয়ে তোলেন। তিনি চেয়েছিলেন দেশী-বিদেশী সমস্ত রাজাকে উচ্ছেদ করে ইতালীতে

প্রজাতন্ত্র স্থাপন করতে। গারিবল্‌ডী ছিলেন তাঁর ডান হাত। শত্রুর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তিনি স্বাধীনতার অভিযানকে অনেকটা এগিয়ে দেন। আর কাভুর ছিলেন কৌশলী। তিনি দেখ্‌লেন—শত্রু শুধু দুর্ধর্ষ নয়—তাদের সংখ্যাও অনেক। কাজেই স্বল্পশক্তি নিয়ে কেবল যুদ্ধের দ্বারা কাজ হাসিল করা যাবে না—কৌশল ও কূটনীতিও চাই। এ ভাবে কূটনীতি ও বল প্রয়োগের দ্বারা তিনি ঐক্যবদ্ধ ইতালীর গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু এ কাজে গ্যারিবল্‌ডীর দানই সব চেয়ে গৌরবের। এই দীর্ঘ ও বাধাবহুল সংগ্রামে তিনি যে মহত্ত্ব, বীরত্ব, সাহস, অধ্যবসায় ও আদর্শনিষ্ঠতা দেখিয়েছেন—অপরের পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব ছিল। তিনি যা করেছেন, তাকে অসাধ্য সাধন বললে এতটুকু অত্যুক্তি হয় না।

অদম্য ও জ্বলন্ত আকাংক্ষা নিয়ে ক্যাপ্টেন গ্যারিবল্‌ডী রোম থেকে জেনোয়ায় এলেন। এখানে এক যুবকের কাছে তিনি জানতে পারলেন যে, 'নবীন ইতালী' নামে একটি দল ইতালীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার আকাংক্ষা জাগিয়ে তোলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। এদের নেতা ম্যাটসিনী। গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয় আনন্দে নেচে উঠল। এতদিন ধরে গোপনে যে স্বপ্ন তিনি দেখে আসছেন—সেরূপ আরও অনেকে দেখ্‌ছে—এবং তাদেরই একজনের সঙ্গে

তাঁর পরিচয় লাভের সুযোগ হবে—এই আবিষ্কারে তাঁর মন আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। মনের এই অবস্থা বর্ণনা করে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ

"দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে, এমন একজন লোকের সন্ধান পেয়ে আমি যতটা আনন্দিত হয়েছিলাম—নূতন জগৎ আবিষ্কার করে কলম্বাসও বোধ হয় ততটা হন নি।"

এ সময়ে ম্যাটসিনী মার্সেল্‌সে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন। গ্যারিবল্‌ডী কালবিলম্ব না করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

ম্যাটসিনী সম্পর্কে গ্যারিবলডী বলেছেন ঃ

"সকলে যখন ঘুমিয়ে, তখন তিনিই একা জেগে ছিলেন ; যখন অন্ধকারে সকলে দিশাহারা তখন একা তিনিই, আমার বন্ধু ও গুরু জোসেফ ম্যাটসিনী, শুধু স্বাধীনতার পবিত্র দীপশিখাকে প্রজ্বলিত রেখেছিলেন।"

মার্সেল্‌সে বসে গ্যারিবল্‌ডী ম্যাটসিনীর ধ্যান, ধারণা ও আদর্শের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পরম আগ্রহে তিনি ম্যাটসিনীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। অবিলম্বে একটা কর্মপন্থাও ঠিক হয়ে গেল। স্থির হ'ল—পিডমণ্টেই তাঁরা প্রথমে আঘাত হানবেন।

কিন্তু এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। রাজা সহজেই এঁদের হটিয়ে দিলেন। গ্যারিবল্‌ডীর উপর আদেশ হ'ল প্রাণদণ্ডের, কিন্তু নাবিকের ছদ্মবেশে পালিয়ে গেলেন একেবারে আর এক জগতে—সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায়, আর ম্যাটসিনী গেলেন ইংলণ্ডে।

দেশীয় রাজ্য পিডমণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা সম্পর্কে একটা কথা বলার আছে। বিদেশীদের বিতাড়নের চেষ্টা না করে ম্যাট্‌সিনী ও গ্যারিবল্‌ডী প্রথমেই স্বদেশীয় রাজার বিরুদ্ধে কেন অস্ত্রধারণ করলেন, তা জানা দরকার।

পরাধীন জাতিগুলির ইতিহাস সব দেশেই একরকম। দেশীয় শক্তির সহায়তা না পেলে একটা দেশ কখনও বিদেশীর অধীন হতে পারে না। শুধু তাই নয়, তার আনুকূল্য ও সমর্থনের উপরেই বিদেশীর প্রভুত্ব বজায় থাকে। ইতালীর অবস্থা ভারতের চেয়েও শোচনীয় ছিল। ভারতবর্ষ ছিল একটা শক্তির অধীন, কিন্তু ইতালী ছিল একাধিক শক্তির অধীন। এদের মধ্যে পোপ ছিল শুধু নামেই পবিত্র। স্বাধীনতার কথা বলা দূরে থাক, কোনরূপ তাঁর মতের বিরুদ্ধে চিন্তাও ছিল বে-আইনী। যাজক গোয়েন্দারা সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। স্বাধীনতার কথা চিন্তা করার জন্য একবার একজন লোকের প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছিল।

জেনোয়ার গভর্ণর এজন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ

"আমরা চিন্তাশীল যুবক পছন্দ করি না। তারা কি চিন্তা করে, সেটা আমাদের জানা দরকার।"

পোপ বুঝেছিলেন, খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ইতালী এক হয়ে গেলে, তাঁর প্রচণ্ড প্রতাপও লুপ্ত হয়ে যাবে। এ ছাড়া, বিদেশীদের বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম করে সমগ্র ইতালীর উপর ধর্মচ্ছত্র বিস্তার করবেন, পোপের সে শক্তিও ছিল না। সুতরাং বিদেশীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ইতালীকে ভোগ করার নীতিই যুক্তিযুক্ত! তাই একতা ও স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সমস্ত ক্রিয়া-কলাপকে বিফল করে দেওয়াই ছিল তাঁর ধর্মনীতি ও রাজনীতি। পোপের আরও সুবিধা ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন রাজবংশের অনেকেই তাঁর শিষ্য। সুতরাং তাঁকে আক্রমণ করার অর্থ প্রায় সমগ্র ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। বিপ্লবীরা এ সব অসুবিধার কথা জানতেন। কিন্তু অসুবিধা আর বাধা কোন কালেই বিপ্লবীদের হতাশ করতে পারে নি।

দক্ষিণ আমেরিকায় আসার কিছুদিন পরেই পোর্তুগীজ শাসনাধীন ব্রেজিলের একটা প্রদেশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই

স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় কয়েকজন ইতালীয় যোগদান করেছিল। কিন্তু পোর্তুগীজদের হাতে তারা ধরা পড়ে যায়। শৃংখলিত অবস্থায় তাঁরা যখন স্থানান্তরিত হচ্ছিলেন, তখন গ্যারিবল্‌ডী দেশীয় লোকদের দুর্দশা দেখে অত্যন্ত অভিভূত হলেন। তাঁর সমস্ত শরীর ক্রোধে জ্বলে উঠ্‌ল। তিনি অবিলম্বে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এবং অল্প দিনের মধ্যেই পোর্তুগীজদের বুকে এমন ত্রাস সৃষ্টি করলেন যে, সাধারণ লোক তাঁর নাম শুনেই ভয়ে কেঁপে উঠত। কিন্তু কিছুদিন পরেই এক ভীষণ ঝড়ে জাহাজ-ডুবি হয়ে গ্যারিবল্‌ডী তাঁর জীবনমরণের সাথীদের সমুদ্রের জলে হারিয়ে এলেন। এই দুর্দিনে তিনি অনিতা রিবেরাস্‌ নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। অনিতা ছিল গ্যারিবল্‌ডীর উপযুক্ত সঙ্গিনী ও সহধর্মিনী। স্বামীর পাশে থেকে কখনো ঘোড়ায় চড়ে কখনও যুদ্ধ জাহাজ থেকে যুদ্ধ করে, তিনি আশ্চর্য সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

এরূপ বিপদ-আপদ ও ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে বারো চৌদ্দ বছর কেটে গেল। তখন ১৮৪৮ সাল। ইউরোপে আবার জ্বলে উঠল জনজাগরণের দীপ্ত বহ্নি। ফ্রান্স রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করল। এই আগুন ইতালীতেও ছড়িয়ে পড়ল। এবার নেতা হলেন পিডমণ্টের রাজা। কিন্তু যুদ্ধে তিনি

অষ্ট্রিয়ানদের নিকট আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন ; এ অপমান তিনি সহ্য করলেন না—ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে দেশান্তরী হলেন এবং কিছুদিন পরেই ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। নতুন রাজা ভিক্টর ইমান্যুয়েল অষ্ট্রিয়ানদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ চালালেন না। তবে গ্যারিবল্‌ডী আর তাঁর সহকর্মিগণকে দেশে ফিরবার অনুমতি দিলেন।

গ্যারিবল্‌ডী প্রায় চৌদ্দ বছর পরে দেশে ফিরলেন। যে দেশের স্বাধীনতা ও ঐক্যের জন্য সুদূর দক্ষিণ আমেরিকাতেও তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, সেই পরম প্রিয় ইতালীর মাটিতে পা দিয়ে তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠল। দেখতে দেখতে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর পুরাণো বন্ধুরা তাঁর পাশে এসে জড়ো হতে লাগল।

এ সময়ে পোপের শাসন অগ্রাহ্য করে প্রজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করল। পোপের রাজ্য ছিল রোম আর তার চারদিকের ভূখণ্ড জুড়ে। গ্যারিবল্‌ডী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দ্রুত রোমে এসে উপস্থিত হলেন। গ্যারিবল্‌ডীর সঙ্গী-সংখ্যা তখন পাঁচ শ'। স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করা সহজ ছিল না। সারা ইউরোপ জুড়ে পোপের শিষ্য। তারা ধর্মগুরুর বিপদে সাড়া দিতে দেরী করল না, রোমনগরী চারদিক থেকে আক্রান্ত হ'ল। মুক্তিকামীদের তখন পিছু হ'টে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল

না। ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্‌ডীও অন্যথা করলেন না। ম্যাট্‌সিনী গেলেন সুইজারল্যাণ্ডে। কিন্তু স্বাধীন ও অখণ্ড ইতালীর আশা তিনি ত্যাগ করলেন না—খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার অস্থি দিয়েই বজ্র তৈরী করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। আর গ্যারিবলডী?

সহকর্মীদের আহ্বান করে তিনি বললেন: "আমাদের এক্ষুণি নিরাপদ এলাকায় পালিয়ে যেতে হবে; কারণ, স্বাধীনতার আগুন আমাদের জ্বালিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু আমি তোমাদের অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য, আশ্রয় কিছুই দিতে পারব না। খাদ্য যদি জোটে, তবেই পাবে। যারা দেশের জন্যে এই কষ্ট এবং জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য স্বীকার করে নিতে রাজী আছ—তারাই আমার সঙ্গে এস—আর যারা না পারবে, তারা আত্মসমর্পণের জন্য থেকে যেতে পার।"

পাঁচ হাজার স্বেচ্ছাসেবক গ্যারিবল্‌ডীর অনুগামী হ'ল। গ্যারিবল্‌ডী অজানার উদ্দেশে রওনা হলেন। চারদিকে শত্রুসৈন্য অনুসরণ করছে, তবু যেতে হবে। নিস্ফল সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করে কোন লাভ নেই। সে সুলভ বীরত্বের মোহ, সস্তা শহীদ হওয়ার আকাংক্ষা গ্যারিবল্‌ডীর কোন দিন ছিল না। সঙ্গীদের নিয়ে অতি দুর্গম পথে যাত্রা করলেন তিনি শত্রুকবল থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। পথশ্রম, অনাহার, অনিদ্রায় অনেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ল—

অনেকে পালিয়ে গেল। অনিতাও আর এগোতে পারছিল না, অথচ বিশ্রাম নেওয়ারও সময় নেই। অনিতা আর পারল না—একদিন ঢলে পড়লো পথের মধ্যেই। শত্রু তখন গ্যারিবল্‌ডীর পিছু নিয়েছে—অনিতাকে কবর দেওয়ার সময়ও তাঁর হ'ল না! শেষ পর্যন্ত একজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে তিনি পিড্‌মণ্টে এলেন। কিন্তু ভিক্টর ইমান্যুয়েল গ্যারিবল্‌ডীকে আশ্রয় দিতে সাহস করলেন না। অগত্যা ছেলেমেয়েদের নাইসে রেখে গ্যারিবল্‌ডী আবার বেরিয়ে পড়লেন আশ্রয়ের সন্ধানে।

আবার দক্ষিণ আমেরিকা। এখানে কিছুদিন একটা মোম-বাতির কারখানায় কাজ করার পর গ্যারিবল্‌ডী একটা জাহাজের ক্যাপ্টেনের পদ পেলেন। এ কাজে তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করেন। এ ভাবে কিছু অর্থ জমিয়ে পাঁচ বছর পরে আবার ফিরে এলেন ইতালীতে। প্রথমেই গেলেন তিনি নাইসে তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে। এখানে তাদের মধ্যে কিছু দিন বাস করে সার্ডিনিয়ার নিকটস্থ একটা দ্বীপে কিছু চাষের জমি কিনলেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি সেখানেই চাষের কাজে দিন কাটাতে লাগলেন। গ্যারিবল্‌ডী ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসতেন। এখানে তাদের তিনি পড়াতেন—তাদের সঙ্গে খেলা করতেন। কিন্তু অন্তরের আগুন তাঁর আগের মতই অনির্বাণ ছিল। তিনি শুধু অপেক্ষায়

ছিলেন—কবে আসবে সুযোগ—কবে আসবে আহ্বান—। প্রতীক্ষা তাঁর ব্যর্থ হ'ল না। সুযোগ সত্যই এল—এবং এল এবার তা সাফল্যের ইঙ্গিত নিয়ে। যদিও সাফল্য তখন সহজলভ্য ছিল না।

১৮৫৯ সাল। ভিক্টর ইমান্যুয়েলের প্রধান মন্ত্রী তখন কাভুর। তিনি দেখলেন একা পিডমণ্টের পক্ষে সমস্ত শত্রুকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব নয়। তাই স্থির করলেন—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবেন। তিনি একদিকে উত্তর ইতালীর জন্য অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সাহায্য চাইলেন—আর অন্যদিকে গ্যারিবল্‌ডীকে প্রস্তুত হ'তে বললেন দক্ষিণ ইতালীকে করায়ত্ত করার উদ্দেশ্যে। আর মাঝখানে পিডমণ্টতো আছেই। এই ত্রিমুখী অভিযানের পরিকল্পনা শীঘ্রই প্রস্তুত হ'ল। কিন্তু ম্যাট্‌সিনী এটা অনুমোদন করলেন না। এক রাজা সরিয়ে,—আর এক রাজার পক্ষ সমর্থন করাকে তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না—তাঁর আদর্শবাদ ক্ষুণ্ণ হবে মনে করে তিনি সহযোগিতা করলেন না।

গ্যারিবল্‌ডী দেখলেন—অন্তত একটা রাজশক্তির সহায়তা না পেলে ইতালীর ঐক্য ও স্বাধীনতা সুদূরপরাহতই থেকে যাবে। যদিও কাভুরের কূটকৌশল তিনি অনুমোদন করতেন না, তবু তিনি

জানতেন—ইতালীর স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর প্রয়োজন শেষ হয় নি; তাই অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফরাসী সৈন্য যখন পিডমণ্টে এল—তখন তিনিও পাঁচ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে কাভুরের পাশে এসে দাঁড়ালেন। যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া পরাজিত হ'ল কিন্তু ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন আর এগোতে রাজী হলেন না। তাঁর রাজ্যের পাশে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রভাব, ভাল মনে হ'ল না তাঁর। তিনি অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে শুধু চুক্তিই করলেন না—উপরন্তু গ্যারিবল্ডীর জন্মভূমি নাইসও দাবী করে বসলেন। কাভুর ও গ্যারিবল্ডী উভয়েই কুপিত হলেন। কিন্তু ভিক্টর ইমান্যুয়েল কাভুরকে বুঝিয়ে নাইস ফ্রান্সের হাতে ছেড়ে দিলেন। গ্যারিবল্ডী কাভুরের এই বিশ্বাসঘাতকতায় আরও ক্রুদ্ধ হলেন। এ শঠতা তিনি জীবনেও ভুলতে পারেন নি।

এ ভাবে স্বাধীনতার সংগ্রাম সফল হ'ল না বটে কিন্তু শীঘ্রই আর একটা সুযোগ এল। সিসিলির জনসাধারণ নেপল্‌সের রাজা ফার্দিনাণ্ডের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে গ্যারিবল্ডীর কাছে খবর পাঠালেন। গ্যারিবল্ডী এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সিসিলি দ্বীপে অবতরণ করলেন। দলে দলে লোক এসে তার সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু সকলেই তারা যুদ্ধে অপটু—শুধু স্বাধীনতার জন্যেই তারা মরণপণ করে রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে—অত্যাচারী রাজার শাসন

তারা উচ্ছেদ করবেই। এদিকে ফার্দিনাণ্ডের প্রচুর লোক লস্কর, প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র, প্রচুর আয়োজন। তথাপি রাজশক্তি পেরে উঠল না। প্রজাসাধারণের সহানুভূতি তাঁর প্রতি ছিল না। প্রজাশক্তিওত নগণ্য নয়। এজন্য একরূপ বিনাযুদ্ধেই গ্যারিবল্‌ডী সিসিলি জয় করলেন। কিন্তু এখনও দক্ষিণ ইতালী বাকী এবং সামনেও সমুদ্র। আর, তা'ছাড়া, ফার্দিনাণ্ডের বেশীর ভাগ সৈন্যই সেখানে। গ্যারিবল্‌ডী দমলেন না। মুষ্টিমেয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়েই সাগর পার হলেন। এখানেও জনসাধারণ দলে দলে তাঁকে অভ্যর্থনা করল। এ যে মুক্তির যুদ্ধ—বহু শত বছরের পরাধীনতার অবসান-চেষ্টা। সিসিলির মত এখানেও তিনি অনায়াসে সাফল্য লাভ করলেন। ওদিকে ভিক্টর ইমান্যুয়েল অষ্ট্রিয়া ও পোপকে হারিয়ে গ্যারিবল্‌ডীর সঙ্গে নেপল্‌সে এসে মিলিত হলেন। গ্যারিবল্‌ডী সানন্দে রাজার হাতে দক্ষিণ ইতালী ও সিসিলির শাসনভার তুলে দিলেন। রাজা গ্যারিবল্‌ডীর সাফল্যে ও সর্বজনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হ'য়ে নেপল্‌সে প্রথমে ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিলেন: গ্যারিবল্‌ডীকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু রাজা তাঁর ভ্রান্তি অবিলম্বে বুঝতে পারলেন।

রাজা তাঁকে সম্মানিত করার জন্য ক্যাটালাফামির প্রিন্স ও সৈন্যাধ্যক্ষের (marshal) পদ এবং ৫০০,০০০ ফ্রাঙ্কস্‌ পুরস্কার গ্রহণ

করতে অনুরোধ জানালেন। গ্যারিবল্‌ডী অনেক ধন্যবাদের সঙ্গে সমস্তই প্রত্যাখান করলেন। ঈর্ষা ও স্বার্থে অন্ধ মানুষের প্রকৃতি তাঁর অপরিচিত ছিল না। তিনি ফিরে গেলেন ছোট গ্রামে, সমুদ্রের ধারে, তাঁর চাষের ক্ষেতে—অতি সাধারণ নাগরিকের মত। শুধু যাবার সময় রাজাকে একটি মাত্র অনুরোধ করলেন, যেন তাঁর বিখ্যাত দশহাজারী সৈন্যদলকে তিনি ভুলে না যান আর তাদের দুঃখ ও অভাব যেন মোচন করেন। তিনি তাঁর দশ হাজার সঙ্গী ও বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে বললেন ঃ

"তোমরা আমার পরম আত্মীয় ও বন্ধু—আমার আন্তরিক অভিবাদন ও প্রীতি গ্রহণ কর। কত দুঃখ, কত কষ্ট, কত আত্ম-ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের ভিতর দিয়ে তোমরা আজ অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছ। তোমাদের নমস্কার করি। তোমাদের কাজ আজও শেষ হয় নি। ইতালীকে তোমাদের কাছে দিয়ে গেলাম,— তোমাদের ইতালীকে তোমরা দেখ।"

গ্যারিবল্‌ডীর গলার স্বর কেঁপে থেমে গেল। দশহাজারী সৈন্যদলের চোখে জল, মুখে কথা নেই, মাথা নীচু—তারা এমনি ক'রে তাদের দুদিনের বন্ধুকে বিদায় দিল।

জাটল্যাণ্ডের যুদ্ধ



১৯১৪ সালে ইউরোপে যে যুদ্ধের দাবানল প্রজ্বলিত হ'য়েছিল, জাটল্যাণ্ডের যুদ্ধ তারই একটি বিশেষ অংশ। এই প্রথম মহাযুদ্ধের অন্যতম কারণ হচ্ছে জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মের বিরাট নৌ-সজ্জা। এর সাহায্যে তিনি ইংলণ্ডের মনে বিশেষ উদ্বেগ সৃষ্টি করেন। নৌবহরের সাহায্যে ইংলণ্ড সমুদ্রপথে প্রায় সমগ্র পৃথিবীর উপর তখন প্রতিপত্তি বিস্তার ক'রেছিল। নৌবাহিনার

চিরন্তন আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল ইংলণ্ডের বাণিজ্যে প্রধান নির্ভর ও যুদ্ধে প্রধান অবলম্বন। কিন্তু জার্মানী ইংলণ্ডের প্রধান প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াল।

১৯১৪ সালের মধ্যভাগে পররাষ্ট্রনীতির চক্রান্তে সর্বগ্রাসী মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। জাটল্যাণ্ডের যুদ্ধ হয় উত্তর সাগরে ১৯১৬ সালের ৩১শে মে। একদিকে বৃটিশ নৌ-সেনাপতি জেলিকোর অধীনে ইংলণ্ডের বিরাট নৌ-বাহিনী—অপরদিকে জার্মান নৌসেনাপতি সিয়ারের তত্বাবধানে জার্মান নৌ-বহর। এই একমাত্র জলযুদ্ধ সেখানে উভয়পক্ষের নৌবহর পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। এই যুদ্ধই সমাধান করেছিল কঠোর ও প্রধান সমস্যা—সমুদ্রপথে অপ্রতিহত আধিপত্য থাকবে কার—ইংলণ্ডের না, জার্মানীর? মহাযুদ্ধের প্রথম ভাগে এবং জ্যাটল্যাণ্ডের যুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ড জার্মানীর পোতাশ্রয়গুলি অবরোধ করে জার্মানীকে ত্রস্ত করে তুলেছিল। জার্মানীর বাণিজ্য-নৌবহরও কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু তাতে জার্মানীর প্রতাপ কিছুমাত্র কমে নি। জাটল্যাণ্ডের যুদ্ধে ইংরাজ নৌ-সেনাপতির মতলব ছিল জার্মান নৌ-বহরকে সাম্‌না-সাম্‌নি আক্রমণ করে, সম্ভব হলে, সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করা আর জার্মান নৌ-সেনানায়কের প্রধান রণ-কৌশল ছিল সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করে অপর্যাপ্ত ডুবোজাহাজ আর জলমগ্ন

বারুদমালা দিয়ে সমগ্র উত্তর সাগর ভ'রে রাখা এবং অজ্ঞাতসারে সম্মুখ যুদ্ধের প্রলোভন দেখিয়ে অন্তর্জলী জাহাজ আর মগ্নগিরির সাহায্যে ইংরাজ নৌ-বাহিনীকে পরাস্ত ও ধ্বংস করা। উভয় পক্ষের নৌ-শক্তির কথা আলোচনা ক'রলে দেখা যায় যে, জার্মানীর নৌবহর রণশিক্ষায় ও শক্তিতে ইংলণ্ডের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না; কিন্তু ইংলণ্ডের রণতরী ছিল জার্মানীর অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষিপ্রগতি। জাটল্যাণ্ডের যুদ্ধ জলযুদ্ধের ইতিহাসে অপূর্ব রণ-কৌশলের এক বিস্ময়কর ঘটনা।

সংঘর্ষের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইংরাজ নৌ-নায়ক বিয়েটির সঙ্গে জার্মান নায়ক হিপার' এর। এই পর্যটক রণপোত-যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিশেষ ক্ষতি হয়েছিল। ইংলণ্ডের কয়েকটি খ্যাতনামা যুদ্ধ জাহাজ, যথা—কুইন মেরী, বার্‌হাম, মালয় প্রভৃতি জার্মান ডুবন্ত জাহাজের আক্রমণের ফলে বিনষ্ট হয়েছিল। ইংরাজ রণতরী "লায়ন"এর নৌ-কর্মচারী মেজর হার্ভের বীরত্ব কাহিনী ইংলণ্ডের নৌ-ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। জার্মানদের আক্রমণে "লায়ন" জাহাজে আগুন লেগেছে, অধিকাংশ নাবিকেরা নিহত হয়েছে, মেজর হার্ভেও বিশেষ ভাবে আহত হ'লেন; শত্রুর কামান বর্ষণে তাঁর দুটি পা-ই দেহচ্যুত হ'ল। আগুন ছড়িয়ে গেল প্রায় সর্বত্র, বাকী শুধু বারুদের ঘর বা ম্যাগাজিন। হার্ভে অতি কষ্টে

গড়াতে গড়াতে এসে টেলিফোনে খবর দিলেন, "বারুদ ঘরের দরজা বন্ধ করে জলের সমস্ত কল খুলে দাও।" ফলে লায়ন ক্ষতবিক্ষত হ'ল কিন্তু ধ্বস্ত হ'ল না। আজও ইংরেজ নাবিকের কাছে হার্ভের উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতার এই নিদর্শন চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯১৪ সালে রুশিয়া বাল্টিক সাগরে জার্মান পর্যটক ক্রুজার মগডেলবুর্গকে ডুবিয়ে দেয়। তার আগে সে তার কাছ থেকে জার্মান নৌ-সেনার গোপনীয় বেতারের সাংকেতিক শব্দমালার পুস্তিকা সংগ্রহ করে যথাসময়ে ইংলণ্ডকে উপহার দিয়েছিল। এরপর জাটল্যাণ্ডের প্রধান যুদ্ধ সুরু হ'ল এবং প্রতিপদে এই পুস্তিকার সুযোগ ইংলণ্ড গ্রহণ করতে লাগল। জাটল্যাণ্ডের যুদ্ধে ইংলণ্ড তার নৌবহর একই সারিতে একটির পাশে আর একটি জাহাজ সাজিয়ে অপেক্ষা ক'রতে লাগল সাম্‌না-সাম্‌নি যুদ্ধ করবে বলে। আর জার্মান নৌ-সেনাপতি সিয়ার তার নৌবহর তিন ভাগে বিভক্ত করে চেষ্টা করতে লাগল যাতে সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে ইংলিশ রণতরীকে ডুবো জাহাজ আর বারুদগিরির জালে আবদ্ধ করে ধ্বংস করতে পারে। ইংলিশ রণতরী এগিয়ে এল, জার্মান নৌবহর তার বিখ্যাত Round about movement অর্থাৎ চক্রাবর্ত কৌশল অবলম্বন করে স্বরচিত ধূমাচ্ছাদনের মধ্য দিয়ে

সরে যেতে লাগল। একবার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ইংরাজ রণপোত-শ্রেণী স্থান বদলের সময় বে-কায়দায় পড়ে গেল। তাদের দু'পাশে অজ্ঞাত বারুদগিরির মালা। তারা নৌ-সেনানায়ক জেলিকোর আদেশ মত নূতন সারি করে দাঁড়াল। একটি জাহাজের পিছনে আর একটি জাহাজ। এই দ্রুত সারি ও স্থান পরিবর্তনে জার্মান নৌ-বহর ত্রস্ত হয়ে প'ড়ল। কিন্তু তখন দিনের আলো শেষ হয়ে এসেছে, অন্ধকার হয়ে আসছে, জেলিকো আর অগ্রসর হ'তে ভয় পেলেন; কারণ, অন্ধকারে শত্রুর অজ্ঞাত ডুবন্ত জাহাজে ও মগ্ন বারুদমালার বিস্ফোরণে বৃটিশ নৌবাহিনী নিমেষে ধ্বংস হ'য়ে যাবে। জেলিকো পুনর্বার সাবধানে তাঁর রণতরীর স্থান পরিবর্তন করলেন যাতে প্রতিপক্ষ আবার উল্টাচালের কৌশল অবলম্বন না করতে পারে। জার্মান নৌ-বহর পরের দিন সকালে সম্মুখ যুদ্ধে আসতে বাধ্য হ'ল। জার্মান নৌ-সেনাপতি সিয়ার বুঝতে পারলেন যে, রাত্রির অন্ধকারে তাঁর সমগ্র নৌ-বহরকে ইংরাজ নৌবাহিনীর নজরের ও নাগালের বাইরে নিয়ে যেতেই হবে। তাঁর প্রধান রণ-কৌশল ছিল মুখোমুখি যুদ্ধ সর্বপ্রকারে বর্জন করা। রাত্রির অন্ধকার ক্রমে সমুদ্র ও সকল দৃশ্য বস্তুকে ঢেকে ফেলল। কখনও কাছে কখনও বা দূরে দেখা যায় বারুদের আগুন, নানা রং এর মশালের চিত্রবিচিত্র সংকেত; আর শোনা যায় বিস্ফোরণের শব্দ, আর সমুদ্রের গর্জন।

সিয়ার মরিয়া হয়ে ঠিক করলেন যে, উত্তরে হর্ণরুফের দিকে তাঁর নৌবহর নিয়ে যাবেন। রাত্রির দুর্ভেদ্য অন্ধকারে তিনি অগ্রসর হলেন সমগ্র নৌবহর নিয়ে। ইংরাজের ইতস্তত টহলদার জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ হ'ল। অক্লান্ত চেষ্টায় এবং অসীম সাহসিকতার সঙ্গে তিনি টহলদার জাহাজ শ্রেণী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে অগ্রসর হতে লাগলেন। ইতিহাসে তাঁর এই দুঃসাহসিক যাত্রা Death Ride বা মহাযাত্রা নামে অভিহিত। প্রায় সমগ্র নৌ বহর এমনি করে মরণের মুখ থেকে উদ্ধার লাভ করল। জেলিকোর কাছে এই প্রস্থানের কোন সঠিক সংবাদ পৌঁছায় নি। কথিত আছে, বেতারে লণ্ডনে এই সংবাদ পাওয়া যায় এবং বেতার যোগেই জেলিকোকে জানানো হয়। কিন্তু জেলিকো এ সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে জার্মান নৌবাহিনীকে বাধা দেবার চেষ্টা করে নি। জেলিকো পরবর্তী কালে বলেন যে, তিনি লণ্ডন থেকে নৌ-দপ্তর-প্রেরিত সংবাদ এত বিলম্বে পেয়েছিলেন যে, তাঁর কিছু করার আর সময় ছিল না।

এমনি করে জাটল্যাণ্ডের যুদ্ধ শেষ হল। ইংলণ্ড বলে যে, জাটল্যাণ্ডের জয় তারই। জার্মানী ঘোষণা করল যে, জয়ী হয়েছে সে। প্রমাণ হিসাবে জার্মানী দেখালে যে, এই যুদ্ধে ইংরাজ নাবিক ও নৌ-বহরের অনেক বেশী ক্ষতি হয়েছে। ইংলণ্ডের প্রায়

৭০০০ নাবিক নিহত বা আহত হয়েছে এবং জার্মানীর হয়েছে ৩০০০। ইংলণ্ড ১৪ খানা নানা ধরনের যুদ্ধ জাহাজ হারাল আর জার্মানী ১১ খানা। হিসাবে জার্মানীর কোন ভুল হয় নি। সাময়িক ভাবে জার্মানীর জয় হ'ল। কিন্তু জার্মানী ইংলণ্ডের প্রবল নৌ-শক্তি ধ্বংস করতে পারে নি বলে পরিশেষে সেই বিরাট নৌ-বহরের প্রভাবেই জার্মানীতে খাদ্য ও যুদ্ধ রসদের সরবরাহ বন্ধ হ'ল এবং খাদ্য ও উপকরণের অভাবে জার্মানী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'ল।



হিণ্ডেনবুর্গ

আজ তোমাদের যাঁর কথা বল্‌ছি, তাঁর নাম হচ্ছে ফিল্ড্ মার্শাল ফন হিণ্ডেনবুর্গ। ১৯১৪-১৮ সালে পৃথিবীব্যাপী যে মহাযুদ্ধ

হয়েছিল, তাতেই তিনি জগতে বিখ্যাত হয়েছেন ; এই যুদ্ধের আগে তিনি এমন কিছু পরিচিত ছিলেন না।

হিণ্ডেনবুর্গ ১৮৪৭ সনে পোসেনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা সকলেই সমর বিভাগের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর বাবাও ছিলেন সৈন্য বিভাগের উচ্চ কর্মচারী। শৈশব কাল থেকেই হিণ্ডেন্‌বুর্গের সেনানায়ক হবার প্রবল ইচ্ছা। ইতিহাসের বীরত্বের কাহিনী তিনি পড়তে ও শুনতে খুব ভালবাসতেন। তাঁর চরিত্রগঠন ও প্রথম শিক্ষা হয় তাঁর মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় ; পিতার কাছে শেখেন দেশকে সেবা করতে, প্রাণ দিয়ে দেশকে ভালবাস্‌তে। মাত্র এগার বছর বয়সে তিনি আত্মীয় পরিজনকে ছেড়ে গেলেন সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য। অতি অল্প দিনের মধ্যে তিনি সাধারণ জ্ঞান অর্জন করে ফিরলেন। যখন মাত্র ১৭ বছর বয়স, তখন তিনি দেশের হয়ে যুদ্ধে গেলেন, এবং KONIGGRÄTZ (কনিগ্রাৎস্‌) এ বিশেষ আহত হ'ন। এর পরই তিনি যোগদান করেন ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধে। পরে জীবনের নানা কাজের মধ্যে তাঁকে জার্মানীর সামরিক কলেজে গণিতের অধ্যাপকতা করতে হয়েছে। ৬৫ বছর বয়সে সসম্মানে অবসর গ্রহণ করে তাঁর একান্ত প্রিয় পল্লীভূমিতে বসবাস করছিলেন জীবনের শেষ দিনগুলো শান্তিতে অতিবাহিত করবার জন্য। তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে, তাঁর

জীবন ওইখানে মোটেই শেষ নয়, সবে আরম্ভ—ডাক তাঁর শীগগির আসছে দেশের তরফ থেকে—নির্জনে বিশ্রাম চলবে না।

যুদ্ধ বাধল—১৯১৪ সনের মাঝামাঝি জার্মানীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। একদিকে পরাক্রান্ত ফরাসী ও ইংরাজ সৈন্য —আর অন্য দিকে রুশিয়ার বিপুলবাহিনী। জার্মানীর কাইজার দেশের এই ভীষণ দুর্দিনে হিণ্ডেনবুর্গকে ডাক দিলেন। হিণ্ডেনবুর্গ বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর দেশের ডাক মাথায় পেতে নিয়ে বল্লেন, 'আমি প্রস্তুত'।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। জার্মানীর উদ্দেশ্য ছিল—প্রথমে তারা ফরাসী সৈন্যকে আক্রমণ করবে, তার পর রুশিয়ার সৈন্যকে। কারণ ফরাসীরা অভিযানে দ্রুততর রুশদের চেয়ে। কিন্তু সংকল্প পূরাপূরি কাজে পরিণত হল না ; রুশিয়াই অপ্রত্যাশিতরূপ দ্রুত আগিয়ে আসতে লাগল। তাদের বিরুদ্ধে জার্মান সেনানীরা তেমন কিছু ক'রে উঠতে পারল না—সেজন্যই বৃদ্ধ হিণ্ডেনবুর্গের তলব পড়ল। তাঁর সহচর হলেন লুডেনডর্ফ।

হিণ্ডেনবুর্গ রুশিয়ার সৈন্যের চেয়ে অনেক কম সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করতে গেলেন। যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ তিনি পালাবার ছল করে পিছিয়ে একটা জলাভূমির ওপর চলে এলেন—তাঁর এসব স্থান বিশেষ ভাবে পরিচিত। রুশিয়া তার ভারী ভারী কামান নিয়ে

জলাভূমিতে নেমে একেবারে বসে গেল।। এখানে যে যুদ্ধ হয়, তা ইতিহাসে 'টেনেন াার্গের' যুদ্ধ বলে বিশেষ পরিচিত। রুশিয়ার হাজার হাজার সৈন্য টেনেনবার্গের যুদ্ধে প্রাণ দিল। পরাজয় সুনিশ্চিত, তাই অপমানের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাদের সেনাপতি স্যামসোনোফ আত্মহত্যা করলেন। রুশিয়ার বিপুল সৈন্যের সঙ্গে অতুল আশা নষ্ট হয়ে গেল—ক্রমে দেশের মধ্যে বিপ্লব দেখা দিল। হিণ্ডেনবুর্গের জয়—তাঁর যশকে জগতে ছড়িয়ে দিল। তিনি হলেন "চীফ অফ দি ষ্টাফ" অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি। কিন্তু যুদ্ধ তা বলে শেষ হয় নি, এত বড় জয়ের পর তখন জার্মানীর জন্য পরাজয় অপেক্ষা করছে। পশ্চিমে তখন পরাক্রমশালী ফরাসী ও মিত্র সৈন্য। তাই হিণ্ডেনবুর্গ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেন; তিনি যে পশ্চিম সীমান্তে খাদ কাটিয়ে ইট দিয়ে পাকা করেন, তাই 'হিণ্ডেনবুর্গ' লাইন বলে খ্যাত। প্রায় দু'বছর জার্মানীর আধিপত্য ছিল পশ্চিম সীমান্তে ঐ লাইনেরই জন্য। তখন অনেকে ভেবেছিলেন এ লাইন আর কেউ ভাঙ্‌তে পারবে না। কিন্তু জগতে সবই সম্ভব। জার্মানী নিরপেক্ষ আমেরিকার জাহাজ ডুবিয়ে দিল। আমেরিকা প্রতিশোধ নেবে বলে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিল। জার্মানীর ভিতর তখন আবার গোলমালও আরম্ভ হয়েছে খুব, কারণ খাদ্যের আর অর্থের অভাব। অনাহারে আর কত দিন চলে? জার্মান সৈন্য ক্রমেই এলিয়ে পড়ল আর সেই

সুযোগে ফ্রান্সের মার্শাল ফস জার্মানীর হিণ্ডেনবুর্গ লাইন ভেঙ্গে জার্মানীকে ধরাশায়ী করে দিল।

দেশের এই ভীষণ শোচনীয় দিনে একা হিণ্ডেনবুর্গ অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ১৯১৯ সনে শান্তি স্থাপিত হল। কিন্তু তখন জার্মানী একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে—তার আর কিছুই আপনার বলতে নেই। বিজয়ীরা কতিপয় বিশিষ্ট লোক আর স্বয়ং কাইজারকে দোষী নির্ণয় করে বিচার করবে বলল। হিণ্ডেনবুর্গ বলে পাঠালেন, "যদি বিচার করতে হয়, ত, আমারই বিচার কর—"।

শান্তিস্থাপনের পর হিণ্ডেনবুর্গ আবার তাঁর শান্তিময় পল্লীজীবনে ফিরে গেলেন। কিন্তু দেশ আবার তাঁকে ডাকল ১৯২৫ সনে—নব গঠিত প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হবার জন্য। জার্মানীর তো একেই দারুণ অর্থকষ্ট তার ওপর ফরাসীরা রুঢ়ের খনি দখল করে বসেছিল। হিণ্ডেনবুর্গ প্রেসিডেণ্ট হবার পর জার্মানী আবার তা ফিরে পেল। এই প্রেসিডেণ্টের পদে তিনি দশ বছর ছিলেন। তিনি যখন তাঁর প্রাণাধিক দেশকে দশের হাতে রেখে চিরবিশ্রামে মগ্ন হলেন ২রা আগষ্ট, ১৮৩৪ সালে—তখনও তিনিই প্রেসিডেণ্ট। এই দশ বছর কাল তাঁর চরিত্রের সকল গুণকে রূপ দিয়েছে—তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, আশ্চর্য কার্যকুশলতা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি যখন

প্রথম প্রেসিডেণ্ট হন, তখন জার্মানী অর্থকষ্টে, লাঞ্ছনায়, অপমানে প্রপীড়িত। হিণ্ডেনবুর্গ সেই শোচনীয় অবস্থা থেকে জার্মানীকে অনেকটা তুলেছিলেন। কিন্তু যেদিন বুঝলেন, হের হিটলারকেও দেশ চাইছে—সেদিন তিনি নিজেও হের হিটলারের কাছে তাঁর চিরউন্নত মাথা নোয়ালেন ; কেন না, দেশ যাকে চাইছে তিনিও তাকে চান। দেশের চাওয়াই হচ্ছে তাঁর চাওয়া। তাঁর জীবনের ব্রতই ছিল দেশের সেবা।



কামাল আতাতুর্ক

তুর্কী পরিখার (trench) ধারে এক তুর্কী সেনানায়ক নিবিষ্ট চিত্তে বসে সামনের বিস্তৃত ও বিক্ষিপ্ত রণভূমির দিকে চেয়ে ছিলেন। অতি ভীষণ গর্জন ক'রে একটার পর একটা ভয়ঙ্কর গোলা বিস্ফোরণ হ'তে লাগল তুর্কী পরিখার অতি নিকটে; উপস্থিত সৈনিকেরা চীৎকার ক'রে উঠল, "সাবধান—সকলে সরে যাও—আশ্রয় নাও।" তাদের সেনানায়ক, নিশ্চিন্ত, নিশ্চল হ'য়ে রইলেন। আরও কাছে এবং আরও সশব্দে বিস্ফোরণ হ'ল; সমগ্র ভূমি কেঁপে উঠল, টুক্‌রো টুক্‌রো জ্বলন্ত আগুন আর

ধূলিমাটি বিক্ষিপ্ত হ'ল সর্বত্র, ধূলায় ও বারুদের ধোঁয়ায় ঢেকে গেল চারিদিক। একটু পরে গোলাবর্ষণ থামল। ধোঁয়া কেটে গেল। আতঙ্ক ও রুদ্ধনিশ্বাসের সঙ্গে সেনাদল দেখল তাদের নির্ভীক নায়ক ঠিক তেমনি স্থিরভাবে বসে আছেন। তাদের মন বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরই স্বাধীন নবীন তুরস্কের জনক—মুস্‌তাফা কামাল পাশা। তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর বিস্ময়কর ঘটনাবলী ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

মুস্‌তাফা কামাল ১৮৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তুরস্ক তখন তার অতীত গৌরবের চিহ্ন বহন করে লজ্জায় অবনত হয়েছিল। সে একদিন তিন মহাদেশ—এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল কিন্তু মুস্‌তাফার জন্মকালে তুরস্ক ছিল দুর্বল ও আভ্যন্তরীণ কু-শাসনে জর্জরিত। তাকে 'ইউরোপের চিররুগ্ন প্রদেশ' নামে অভিহিত করা হয়েছিল।

অতি সাধারণ পরিবারে মুস্‌তাফার জন্ম হয়। তাঁর পিতা আলি রেজা তুরস্কের সুলতানের অধীনে সামান্য চাকুরি করতেন। তাঁদের আর্থিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না। তাঁর মাতা ছিলেন জুবেদা হানুন্। জুবেদা হানুনের ইসলাম ধর্মে, শিক্ষায়-সংস্কারে অটুট আস্থা ছিল। তিনি মুস্‌তাফাকে

সেই আদর্শে মানুষ করার অভিপ্রায়ে এক মুসলিম স্কুলে পাঠান। মুস্তাফাকে কিন্তু সে স্কুলের শিক্ষা একটুও আকৃষ্ট করে নি। কিছু দিনের মধ্যেই, তখন মুস্তাফার বয়স ন' বছর, আলি রেজার মৃত্যু হ'ল। জুবেদা হানুন্ এক শিশুপুত্র ও এক শিশুকন্যাকে নিয়ে জীবনের নিষ্ঠুর সমস্যার সামনে দাঁড়ালেন। আর্থিক অনটন বাধ্য ক'রল মুস্তাফাকে সে স্কুল পরিত্যাগ করতে। এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় দূরে একটা গ্রামে তাঁদের আশ্রয় দিলেন। মুস্তাফা মেষপালকের জীবন যাপন করতে লাগলেন; কিন্তু জুবেদা হানুনের প্রধান সংকল্প ছিল মুস্তাফাকে দেশে ও সমাজে কৃতীসন্তান হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা—তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারলেন না; অমানুষিক পরিশ্রমের সাহায্যে যে অর্থ তিনি সঞ্চয় ক'রলেন, তাই দিয়ে মুস্তাফাকে এক নতুন স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

স্কুলে মুস্তাফা আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরদের জীবনকাহিনী ও বিখ্যাত যুদ্ধের ঘটনাবলী পড়তে ভালবাসতেন। সৈন্যদলে যোগ দেওয়া ছিল তাঁর আশৈশবের আকাংক্ষা। তুর্কী সৈন্যবেশ পরিহিত সেনানায়কদের স্কুলের দ্বারদেশ থেকে দেখে তাঁর মন উৎসাহে নেচে উঠত। আজন্মবিপ্লবী মুস্তাফার সৈনিকজীবন গ্রহণের আকাংক্ষা শেষ পর্যন্ত দৃঢ় সংকল্পে পরিণতহল।

স্কুলের গতানুগতিক নিয়ম-কানুন তাঁহার বিদ্রোহিমনে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি ক'রেছিল। অর্থহীন পুরানো বিধি ও সংস্কার শৃংখলভারের মত কষ্টদায়ক হয়েছিল। তাঁর কোন বন্ধু ছিল না। তিনি প্রাকৃত জন-সুলভ হাস্যপরিহাসে কখনও অংশ গ্রহণ করতেন না। তাঁর কিশোর চরিত্রের অস্বাভাবিক দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা সহপাঠীদের মধ্যে পরিহাস ও শিক্ষকদের বিরক্তির কারণ হ'ল। একদিন অকারণে এক সতীর্থ মুস্তাফাকে অপমান করে। মুস্তাফা কিঞ্চিৎ প্রহারের দ্বারা তাকে উচিত শিক্ষা দেন। কিন্তু এক শিক্ষক এসে জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধান না ক'রে, মুস্তাফাকে নিমমভাবে প্রহার ক'রেন। দুর্বল সহপাঠীরা মুস্তাফার ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মুস্তাফা দিনের শেষে স্কুল থেকে অবনত মস্তকে গৃহে ফিরলেন। আর কোন দিনই তিনি সেই স্কুলে ফিরে যান নি। জুবেদা হানুন অনেক অনুনয়, অনেক তিরস্কার, অনেক পরামর্শ দিলেন, কিন্তু মুস্তাফা পর্বতের মত অটল স্থিরসংকল্প হয়েই রইলেন। তিনি বললেন, "যে স্কুলে অন্যায়ের বিচার হয় না—যেখানে শিক্ষার নামে অত্যাচার হয়, সে স্কুলে আমি পড়ি না।"

কিছুদিন পরে মুস্তাফা এক সৈন্য বিভাগীয় উচ্চতন কর্মচারীর সাহায্যে স্যালোনিকার সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। অতি

অল্প সময়ের মধ্যে এই স্কুলে মুস্তাফা বিশেষ খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেন। স্কুলে মুস্তাফা অস্থিরচিত্ত ছিলেন; কিন্তু অবসর সময়ে তাঁকে বিশেষ চিন্তামগ্ন দেখা যেত। সহপাঠীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রত, "তোমার জীবনের আকাংক্ষা কি?" মুস্তাফা উদ্দীপ্ত মুখে সপ্রতিভভাবে উত্তর দিতেন, "আমি একদিন বড় হ'ব আর আমার দেশকে বড় ক'রব।"

স্যালোনিকার সামরিক স্কুল থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'য়ে মুস্তাফা কন্স্টান্টিনোপলে বিখ্যাত সামরিক কলেজে ভর্তি হলেন। এখানে তিনি একদিকে যেমন সামরিক শিক্ষা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে গ্রহণ করতে লাগলেন, অন্যদিকে তেমনি সর্বদাই চিন্তা করতেন তুরস্ককে ভগ্নস্তূপ থেকে কেমন করে আবার একটা বিরাট শক্তিশালী দেশে পরিণত করা যায়।

এই কলেজে তিনি অসাধারণ বুদ্ধি, অসামান্য স্মরণশক্তি ও বিবেকবত্তার পরিচয় দেন। তাঁর অঙ্কের শিক্ষক তাঁর কৃতিত্বে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে কামাল (prefect) নামে অভিহিত করেন।

এখানে তিনি কয়েকজন তেজস্বী যুবকের সংস্পর্শে আসেন। কুসংস্কার ও কু-শাসনে পূর্ণ পুরানো তুরস্ককে ভেঙ্গে নতুন ও

প্রগতিশীল তুরস্ক সৃষ্টি করা ছিল এঁদের জীবনের প্রধান ব্রত। এই গুপ্ত সমিতির নাম Vatna অর্থাৎ পিতৃভূমি। অল্প দিনের মধ্যেই কামাল এর শীর্ষস্থান অধিকার করলেন। এঁরা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তুরস্কের উন্নতিসাধন, সুলতান ও তাঁর পক্ষীয়দলের উদ্দেশ্য নয়, প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের পরিপুষ্টিই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং কামাল ও তাঁর সহকর্মীদের ধর্ম হ'ল প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ধ্বংস ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কর্তৃপক্ষ এই গুপ্তসমিতির উপর দৃষ্টি রেখেছিল। কর্তৃপক্ষের নিকট কোনরূপ রাজনীতিক আলোচনা ও প্রচার বিষবৎ ছিল। তাদের এক গোয়েন্দা এই গুপ্তসমিতির সংস্পর্শে আসার সুযোগ সংগ্রহ করে। অনতিকাল পরে তারই সাহায্যে রাজদ্রোহের অভিযোগে কামাল ও তাঁর সহকর্মীদের সরকারপক্ষ গ্রেপ্তার ও বন্দী করে। বৃদ্ধা জুবেদার অক্লান্ত চেষ্টা ও আত্মত্যাগের ফলে কামালের প্রাণদণ্ড হ'ল না। কিন্তু সুলতান বিদ্রোহী সৈনিকদের সরিয়ে দিলেন দুর্গম ও বিপৎসঙ্কুল সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে—অনিবার্য মৃত্যুর মুখে।

দুর্দান্ত কামাল মৃত্যুকে উপেক্ষা ক'রে তাঁর জীবনের পরমব্রত উদ্‌যাপনের পথ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। ১৯০৮ সালে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা ছড়িয়ে গেল তুরস্কতে। সুলতানের কু-শাসনের

প্রায় অবসান হ’য়ে এল। পররাষ্ট্রলোলুপ ইউরোপীয় রাজ্যগুলি চোরের মত চুপি চুপি তুরস্কের নানা অংশ আত্মসাৎ করতে স্থুরু ক’রল। ওদিকে কামাল সিরিয়ায় নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি এখানে এক পুরাতন বন্ধুর সংস্পর্শে আসেন, স্বদেশের সেবার জন্য তিনিও নির্বাসনে জীবন-যাপন ক’রছিলেন। উভয়ের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব স্থাপিত হ’ল। এবং অল্পদিনের মধ্যেই গাণতন্ত্রিক রাষ্ট্রের উপকারিতা প্রচারের জন্যে গুপ্তসংঘ (ভাটনা) সংগঠন করেন। কামাল তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সহরে এই সংঘের শাখা-প্রশাখা স্থাপন করেন। একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হ’ল জনসাধারণের কাছে কামাল ও তাঁর সহকর্মীর ডাক পোঁছে দেবার জন্যে। কামাল ছদ্মবেশে স্যালোনিকা এসে তাঁর পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হ’লেন ও তাঁদের সহযোগিতায় তিনি (Committee of Union & Progress) একতা ও প্রগতিশীলতার, সমিতি গঠন করলেন। এই সমিতিরই প্রচেষ্টায় পরবর্তী কালে তুরস্কে সর্বপ্রথম প্রতিনিধিমূলক শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

কিছুদিনের মধ্যে ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ স্থুরু হ’ল। আন্তর্জাতিক কারণে তুরস্ক জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিল। তুরস্কের চারিদিকে শত্রুর ব্যূহ—পূর্ব-পশ্চিমে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স; উত্তরে রুশিয়া ও দক্ষিণে বিদ্রোহী আরব প্রজারা।

জার্মানীর পক্ষ সমর্থন ক'রে তুরস্কের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়ে উঠ্‌ল। শত্রুদের আক্রমণের চাপে রাজ্যমধ্যে অরাজকতা ও বিশৃংখলা ঘট্‌ল। আর বাইরে সে তার মিত্রশক্তির সঙ্গে প্রায় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল।

তুরস্কে খাদ্য ও সমরোপকরণের একান্ত অভাব দেখা দিল। ভীরু সুলতান সন্ত্রস্ত। ১৯১৮ সালে মার্চ মাসে ইংলণ্ডের চার্চিল এক বিরাট বাহিনী সমুদ্রপথে পাঠালেন তুরস্ক-জয়ের আশায়। কন্‌স্টান্‌টিনোপল নগরী ত্রাসে বিনিদ্র রজনী যাপন করছিল। তুরস্কের সম্পূর্ণ পরাজয় ও পতন প্রায় সুনিশ্চিত। সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি তখন তুরস্কের এই মহাসর্বনাশের চরম অধ্যায়ের উপর। কিন্তু তুরস্ক মাথা তুলে দাঁড়াল। লক্ষ-লক্ষ তুর্কী মৃত্যুকে বরণ ক'রল এই সংগ্রামে। ইংলণ্ডের অজস্র গুলি-গোলা বর্ষণে সহস্র-সহস্র তুর্কী সেনা আহত ও নিহত হ'ল কিন্তু তুরস্কের পতন হল না; ক্ষতবিক্ষত তুরস্ক আঘাতে ও ত্রাসে কাঁপতে লাগ্‌ল। এ যুদ্ধে কামালপাশা ও তাঁর সহকর্মীদের অবদান অপরিসীম। চাচিল ও তাঁর মিত্রশক্তির তুরস্ক জয়ের পরিকল্পনা তখনকার মত ধূলিসাৎ হ'ল। ডিসেম্বর মাসে ইংরেজ তার মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের সরিয়ে নিতে বাধ্য হল।

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হ'ল; সেই সঙ্গে পরাজিত হ'ল তার মিত্র তুরস্ক। ভীরু, অত্যাচারী সুলতান তৎক্ষণাৎ ইংরাজের সাহায্যে নিজের ভঙ্গুর ও শূন্যগর্ভ আধিপত্য তুরস্কের উপর জাহির করার জন্য তৎপর হলেন। তাঁর কন্স্টান্টিনোপলের গৌরব আর আভিজাত্য ধূলিসাৎ হ'ল বিজয়ী সেনাবাহিনীর উদ্ধত পদক্ষেপে। কামাল এসিয়া মাইনরে আনাতোলিয়ায় আশ্রয় নিলেন। এখানে আসবার পূর্বে কামাল তাঁর বৃদ্ধ ও অর্ধান্ধ মাতার কাছে বিদায় নিতে গেলেন। আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথায় কাতর জননী তাঁর পুত্রকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রলেন; মাতার চোখের জল গড়িয়ে গেল কামালের মুখে, চোখে ও মাথায়। কিন্তু বীর পুত্র তৎক্ষণাৎ জননীর মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন, "একি মা, তুমি কাঁদছ ? তোমার চোখে জল কেন? তুমি কি ভুলে গেলে যে, তোমার কামাল যোদ্ধা ? তার ধর্মই হ'ল যুদ্ধ—অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে।" জুবেদা অন্য যুগের লোক ছিলেন—রাষ্ট্র ও ধর্মের কর্তা সুলতানের আধিপত্যে তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল, তাই বল্লেন, "বাবা, সুলতানের পদানুসরণ ক'রো। যোদ্ধা পুত্র উত্তর দিলেন, "সুলতানের ? আনুগত্য সুলতানের উপর নির্ভর করে, আমার উপর নয়।"

কামাল আনাতোলিয়ায় পৌঁছে প্রথম দিকে নিরুপায় হ'লেও রাত্রিদিন তাঁর চিন্তা ছিল কেমন করে তুরস্কের সম্মান ও স্বাধীনতা

পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। কিছুদিন পরে কামাল আনাতোলিয়ায় গুপ্তসমিতি স্থাপন করলেন। তরুণের দল তাতে যোগদান ক'রল। কামালের যাদুস্পর্শে সকল শ্রেণীর লোকের উপর নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রভাব বিস্তারের সংবাদ পৌঁছল সুলতানের কানে। কামালের উপর আদেশ হ'ল ফিরে যাবার। কামাল আনাতোলিয়া ছেড়ে যেতে অস্বীকার ক'রলেন। আদেশ অমান্য করায় ক্ষিপ্ত কর্তৃপক্ষ কামালকে বিদ্রোহের অভিযোগে দূর ক'রে দিল সুলতানের সৈন্যবিভাগ থেকে। এর অনতিকাল পরে জন্মযোদ্ধা ও বিদ্রোহী কামালের নেতৃত্বে আনাতোলিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কামাল আনাতোলিয়ায় এক জাতীয় পরিষদ গঠন ক'রলেন। সিবাসে এর প্রথম অধিবেশন হ'ল। সুলতানের আদেশ এল সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে, "বিদ্রোহী কামালকে বন্দী কর।" সৈন্যাধ্যক্ষ সুলতানের অনুগত হ'লেও, নেক্‌ড়ের মত চতুর ও পরাক্রমশালী কামালের দেহে ও কর্মে হস্তক্ষেপ করার সাহস পেলেন না। চতুর কামাল উপলব্ধি ক'রেছিলেন যে, সুলতানের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে বিদ্রোহের সময় তখনও হয় নি; তাই তিনি সিবাসের জাতীয় পরিষদ থেকে সুলতানের আনুগত্য উচ্চ কণ্ঠে প্রচার ক'রলেন। তিনি পরিষদে তাঁর ভাষণে বল্‌লেন,—"নতুন তুরস্ক সৃষ্টি কর'তে হ'বে।...তুরস্কের মহাসমস্যার সমাধান ক'রবে, বিশ্বাস, একতা ও সক্রিয়তা।...যুদ্ধ আর রক্তপাত সমস্যার সৃষ্টি করে, সমাধান

করে না। তুরস্কের গৌরব ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে হ'বে··· পৃথিবীতে হয় স্বাধীন তুরস্ক থাকবে, না হয়, তুরস্কের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে।···তুরস্ক তুরস্কবাসীর, এখানে বিদেশী দালালের স্থান নেই।···" তিনি গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে, বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন, "সুলতান আর তুরস্ককে বাঁচাও—বিদেশী শত্রু সব গ্রাস ক'রল। তিনি বুঝেছিলেন—কুসংস্কারান্ধ, অর্ধমূর্খ তুর্কীদের কাছে প্রথমেই সুলতানের বিরোধিতার কথা বল্লে চল্বে না। ধীরে ধীরে আর অতি সন্তর্পণে তাদের মুক্ত ক'রতে হবে।

এদিকে প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানে—সন্ধি স্বাক্ষরের সময় এল। বিজয়ীদের সন্ধি-সর্ত প্রকাশিত হ'ল—তুরস্কের অপমান ও লাঞ্ছনার সীমা রইল না—সে সন্ধি আর পরাধীনতায় কোন প্রভেদ থাকল না। অকর্মণ্য সুলতান তাঁর মসনদের মোহে বিনাপ্রতিবাদে সর্ত গ্রহণ ক'রল। কিন্তু প্রতিবাদ এল বিদ্রোহের রূপে আনাতোলিয়া থেকে কামালের নেতৃত্বে। সদর্পে আনাতোলিয়া সন্ধিসর্ত অগ্রাহ্য করল। তুরস্কের সর্বত্র তখন অত্যাচার, অরাজকতা, অভাব, অনাহার নিত্য সহচর হ'য়ে উঠেছে। ধর্মান্ধ তুরস্কবাসী সম্পূর্ণভাবে নিরুপায়।

প্যারিসে সন্ধিসভায় তালপাতার বিধাতাপুরুষরা—আমেরিকার উইলসন, ইংলণ্ডের লয়েড জর্জ ও ফ্রান্সের ক্লিমেঁস্যু তুরস্কের এক

সাধারণ সৈনিকের ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হ'লেন। তাঁরা বল্‌লেন—"তুরস্ক তো পরাজিত—সুলতান সাগ্রহে সর্ত গ্রহণ করেছে—শুধু এক অজ্ঞাত সেনা আর তার মুষ্টিমেয় তুর্কী সহযোগীদের এত সাহস?" অবিলম্বে আনাতোলিয়াকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেওয়া হ'ল গ্রীসকে। ইংলণ্ড মুক্তহস্তে সমরোপকরণ দিয়ে গ্রীসকে প্রস্তুত ক'রল।

কামাল সম্মুখীন হ'লেন এই অগ্নিপরীক্ষার। যুদ্ধক্ষেত্রে কামালের অনন্যসাধারণ সংগঠন শক্তি, সাহস, বুদ্ধি ও নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ভাবে অভিব্যক্ত হ'ল। সৈন্যপরিচালনা, আক্রমণের পরিকল্পনা, কুচকাওয়াজ, সমর সরবরাহের ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্যায় তিনি রাত্রি-দিন মগ্ন থাকতেন। বিশ্রাম, নিদ্রা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ ক'রল। যুদ্ধ সুরু হ'ল। কামাল প্রধান সেনানায়ক—কামাল সর্বেসর্বা—এ সুযোগ, এ মহামুহূর্তের জন্য তিনি আজীবন নিজেকে প্রস্তুত ক'রেছেন। আজকের গুরুদায়িত্বের আহ্বানে কামাল সানন্দে অগ্রসর হলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের পরম বিপৎসঙ্কুল স্থানে কামাল নিজে সৈন্যদের নির্দেশ ও উৎসাহ দিতে লাগ্‌লেন। কতবার তাঁর সামনে খুব নিকটে গুলিবর্ষণ হ'ল কিন্তু কামাল এক পা-ও সরে দাঁড়ালেন না—নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া তো দূরের কথা। তিনি বলতেন, "আমার যদি সাহসের অভাব হয়, আমার

সৈন্যদেরও সাহস থাক্‌বে না। মৃত্যুকে ভয় ক'রলে চল্‌বে না। এস, আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করি।" যুদ্ধে বিপদের সামনে তিনি তাঁর সঙ্গে আর এক সাধারণ সৈনিকের কোন প্রভেদ রাখতেন না। এ যুদ্ধে এক মহাসঙ্কটে সৈন্যদল থম্‌কে দাঁড়াল। কামাল সৈন্যদের ডাক দিয়ে বল্‌লেন, "পেছুলে চল্‌বে না, এগিয়ে চল; আমিই তোমাদের সবাগ্রে যাচ্ছি, এস।" শত্রুর ভীষণ আক্রমণ উপেক্ষা ক'রে কামাল প্রথম অগ্রসর হলেন। দ্বিধাজড়িত সৈন্যদল নিমেষে রণ-হুঙ্কার দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ যুদ্ধে অতর্কিতে পড়ে গিয়ে তাঁর একটা পাঁজর ভেঙ্গে যায়—তিনি বিশ্রামের পরিবর্তে ঘোষণা করলেন, শত্রুকেও এমনি ক'রে তিনি ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করবেন। যুদ্ধে তিনি জয়ী হ'লেন। তুরস্কের জাতীয় পরিষদ তাঁকে "গাজি" অর্থাৎ "বিজয়ী" উপাধিতে ভূষিত ক'রল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ক্রোধের সীমা রইল না। গ্রীস তার পরাস্ত সৈন্যবাহিনী অবিলম্বে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। জুবেদা তখনও জীবিত কিন্তু অন্ধ ও অতি বৃদ্ধা। পুত্রের জয়-গৌরবে তাঁর দু' চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল; তিনি তাঁর পুত্রকে পেলেন কাছে—সুলতানের সামান্য কর্মচারীর বেশে নয়—সমগ্র তুরস্কের ত্রাণকর্তারূপে। তাঁর অনেক যুগের কামনা আর অশেষ কষ্ট সার্থক হ'য়ে উঠ্‌ল সেদিন।

এভাবে তুরস্কের সর্বময় কর্তা হ'য়ে কামাল অভ্যন্তরীণ শাসনপদ্ধতির আমূল পরিবর্তনে মন নিয়োগ ক'রলেন। জাতীয় পরিষদ সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল। সুলতান তাঁর বন্ধু বৃটিশ-রাজের সাহায্য ভিক্ষা চাইলেন। বৃটিশরাজ তাকে 'পলায়নে-নিরাপদ' উপদেশ দিলে তিনি এক বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজের সাহায্যে পলায়ন ক'রলেন। জাতীয় পরিষদের ঘোষণা অনুসারে কামাল তুর্কী গণতন্ত্রের সভাপতি ও প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হ'লেন। তিনি খলিফাকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে খিলাফতী প্রভাবও তুরস্ক থেকে দূর করলেন—তার সঙ্গে দূর হল ধর্মের নামে কুসংস্কার ও রাষ্ট্রের নামে কু-শাসনের বহুশতাব্দীর কলঙ্ক।

মোল্লা-মৌলবী-পীরদের পীঠস্থান, মসজেদ ও ধর্মকেন্দ্রগুলি, যেখানে অন্যায়, ব্যভিচার ও কুসংস্কারের রাজ্য ছিল, সেগুলিকে ধূলিসাৎ করে সেগুলিতে সঞ্চিত বিপুল অর্থ নিয়ে তৈরী হ'ল আধুনিক শত শত চিকিৎসালয়, পাঠাগার ও শিক্ষাকেন্দ্র। তিনি জানতেন, শিক্ষাই জনসাধারণের প্রাণশক্তি। তুর্কী দিনপঞ্জিকা আধুনিক মতে প্রবর্তিত হ'ল। আরবী অক্ষরের বদলে রোমান বর্ণমালা প্রচলিত হ'ল। এসব যুগান্তকারী বিপ্লবে যারা বাধা দিল, তারা প্রাণ হারাল। কামাল

শিশুকাল থেকে অশেষ বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়ে মানুষ হওয়াতে কোন ধরণের প্রতিবাদ অথবা বাধা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর বহু সহকর্মীর বিরোধিতার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড হল—তাঁর মহাব্রত ও কর্তব্য ছিল তুরস্ককে বড় করা। এ মহৎ কর্তব্য পালনে কিন্তু স্নেহ-মমতার স্থান ছিল না। তাঁর নির্মম ও সুকঠিন নেতৃত্বে শিশু তুরস্ককে ঘরে-বাইরে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, ঐশ্বর্যে ও ঔদার্যে আধুনিক রাষ্ট্রমণ্ডলীর সমকক্ষ ক'রে তুললেন।

এক সংবর্ধনা সভায় তুরস্কতে ইংরাজ রাজদূতকে কামাল বলেছিলেন, "আমার মৃত্যুর পর আমার স্থান সহস্র সহস্র কৃতী তুর্কী অধিকার ক'রবে।" ইংরাজ রাজদূত সতর্কতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উত্তর দেন, "আপনি সহস্রগুণ অত্যুক্তি ক'রছেন।"

১১ই নভেম্বর ১৯৩৮ সালে কামাল পাশার মৃত্যু হয়। সংসারে আত্মীয় স্বজন বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাঁর ছিল না। তাঁর ঐশ্বর্য ছিল নবীন তুরস্ক—আর তুরস্কের তিনি ছিলেন অমূল্য সম্পদ। প্রায় উনিশ বছর আগে ১১ই নভেম্বর তুরস্ক পরাস্ত, অপমানিত, পরাধীন ও পদদলিত হয়ে ছিল আর ১৯৩৮ সালের ১১ই নভেম্বর? সে মহাশোকে মগ্ন কিন্তু জাতীয় আভিজাত্যে ও গৌরবে উদ্দীপ্ত।

স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ



"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যাগ্র মেদিনী"—দুর্যোধনের এই সদম্ভ উক্তি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সফল হয় নি বটে, কিন্তু তার বহুযুগ পরে রুশ জনসাধারণ ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে নাৎসী জার্মাণীকে এ উক্তির সার্থকতা বুঝিয়ে দিয়েছিল। রুশ জনসাধারণ প্রতিজ্ঞা করেছিল, শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ তারা চালিয়ে যাবে। এই-যে-সংকল্প, এটা ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে যতটা সার্থকতা লাভ করেছিল এমন বোধ হয় আর কোন যুদ্ধে হয় নি। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রুশ জনসাধারণ যে বীরত্ব,

যে তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা এবং স্বদেশপ্রেম দেখিয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে সেই গৌরবের কাহিনী সোনার আখরে লেখা থাকবে। এ কাহিনী উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর, রূপকথার অসাধ্য সাধনের চেয়েও বিস্ময়কর। ষ্টালিনগ্রাডের প্রত্যেকটি অধিবাসী যেন সেদিন গ্রীক পুরাণের হারকিউলিসের সাহস ও সংকল্প নিয়ে নাৎসী জার্মাণীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

আগেকার যুদ্ধের সঙ্গে আজকালকার যুদ্ধের কোন তুলনাই হয় না। আগে দুইপক্ষের সৈন্যদল নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে হাতাহাতি যুদ্ধ করত। জনসাধারণ থাকতো নেপথ্যে—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে—সহরে ও গ্রামে। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা দ্বারা যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হ'ত না,—সৈন্য-বাহিনীর বাহুবলই চূড়ান্ত মীমাংসা ক'রত। নির্বিরোধ নিরীহ জনসাধারণ সেই মীমাংসাকেই স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নিত। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান তার যুগান্তকারী আবিষ্কারের দ্বারা যুদ্ধের এ রূপ সম্পূর্ণ বদ্‌লে দিয়েছে। এখন আক্রান্ত দেশের সমগ্র এলাকাই যুদ্ধক্ষেত্র; আক্রমণকারীর দেশও এই বিপদ থেকে মুক্ত থাকে না। আক্রান্ত দেশের বিমানবাহিনী বাজপাখীর মত সে দেশে গিয়ে বোমা বর্ষণ করে আসে। সুতরাং জনসাধারণ এখন কেবল সরকারের উপরে ভরসা করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে

না—শত্রুকে প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে হয়। শুধু তাই নয়, অনেক সময় এও দেখা যায় যে, সরকার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ না করে যুদ্ধের অভিনয় করে অথবা দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করতেও দ্বিধা বোধ করে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এশিয়া ও ইউরোপের রণক্ষেত্রে এ রকম ঘটনা বারবার ঘটেছে। এ সব ক্ষেত্রে জনসাধারণকেই এগিয়ে আসতে হয়েছে প্রতিরোধের দায়িত্ব নিয়ে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আজ এই গণতন্ত্রের যুগে একটা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অর্থ শুধু সে দেশের সরকারের বিরুদ্ধে নয়—সে দেশের সমগ্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে—দেশের গণশক্তির বিরুদ্ধে। এ সব কারণেই আজকালকার যুদ্ধকে গণযুদ্ধ বলা হয়। যেখানে যুদ্ধ প্রকৃত গণযুদ্ধে পরিণত হয়, সেখানে আক্রমণকারী যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করেও সুবিধে করে উঠতে পারে না। নাৎসী জার্মাণীর বিরুদ্ধে রুশিয়া এই গণযুদ্ধই করেছিল এবং এজন্যেই জার্মাণীর বিস্ময়কর রণশক্তিও রুশ জনসাধারণের প্রতিরোধের মুখে চূরমার হয়ে গেল।

জার্মাণীর ডিক্টেটর নাৎসী নেতা হের হিটলার ব্যক্তিগতভাবে রুশিয়া আক্রমণের জন্য দায়ী। ষ্ট্যালিনগ্রাড আক্রমণের পর তিনি সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, "ষ্ট্যালিনগ্রাড করায়ত্ত হতে আর দেরী নেই—এবং এ জয় আমার ব্যক্তিগত জয় হবে" কিন্তু

হিটলারের সে দম্ভ ষ্ট্যালিনগ্রাডের জনসাধারণ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।

প্রায় বিনা বাধায় ইউরোপ জয় করে হিটলার ভেবেছিলেন যে, তাঁর দুর্বার আক্রমণের স্রোতে রুশিয়া তৃণখণ্ডের মত ভেসে যাবে। কিন্তু মদমত্ত হিটলারের একথা ভাববার অবকাশ হয় নি যে, রুশিয়া,—ডেনমার্ক, ফ্রান্স, রুমানিয়া, প্রভৃতি দেশের মতো দেশ নয়—তার ভৌগোলিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অন্য দেশগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একশো বছরেরও আগে নেপোলিয়ান এ কথা উপলব্ধি করেছিলেন, মস্কো আক্রমণের বিপর্যয়ে। শত্রুর অস্ত্র-দানবের গর্জনে রুশিয়ার অধিবাসী কেঁপে ওঠে না বরং পাল্টা গর্জনে তাকে নীরব করে দেবার জন্যে প্রস্তুত থাকে এবং সে গর্জনের পিছনে যে শক্তি পুঞ্জিত, তা শুধু গোলা-বারুদ নয়, শুধু ট্যাংক-এরোপ্লেন নয়—সে শক্তির মূল উৎস অদম্য মনোবল আর অজেয় স্বদেশ-প্রেম। ধ্বংসের আগে মানুষ বোধ হয় নিজের শক্তির পরিমাপ করে উঠতে পারে না; তাই বুঝি নিশ্চিত বিপদকে ভুল করে তাকে অগ্রাহ্য করতে চায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ হঠকারিতার দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নয়। কিন্তু হিটলারকে ধন্যবাদ যে, তিনি তাঁর দুবুর্দ্ধি দ্বারা পরোক্ষভাবে এমন এক ইতিহাস রচনা করে গেছেন, যাতে মদমত্ত হঠকারিতার পরিণাম যে কি শোচনীয়

বিশ্ববাসী সেশিক্ষা পাবে এবং যা চিরকালের জন্যে মানুষকে মহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধির সংগ্রামের জন্য প্রেরণা যোগাবে। ষ্ট্যালিনগ্রাডের রণাঙ্গনেই এ ইতিহাস রচিত হয়েছে।

রুশিয়া একটা ছোটখাট দেশ নয়; আয়তনে এই ভূখণ্ড পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ। ১৯৪১ সালের বাইশে জুন হিটলারের যান্ত্রিক বাহিনী মস্কো ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বিরাট দেশের হাজার হাজার মাইল সীমান্ত অতিক্রম করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে উল্লিখিত এলাকাসমূহ দখল করাই ছিল আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য। ষ্ট্যালিনগ্রাডের আক্রমণ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটি উপায় মাত্র।

১৯৪২ সালে হিটলারের প্রধান লক্ষ্য ছিল ককেশাসের তেল। রুমানিয়ার তেল ছাড়া হিটলারের অধিকারে আর কোন তেল-এলাকা ছিল না। তেল না হলে আধুনিক যুদ্ধ চলে না—বিশেষ করে, তড়িৎ যুদ্ধের পদ্ধতিকে (Blitzecrigg) কার্যে পরিণত করতে হলে এ বস্তুটি একেবারেই অপরিহার্য। কাজেই শুধু রুমানিয়ার তেলের উপর নির্ভর চলে না। ককেশাসের তেলও আবশ্যক। এ জন্য ভল্‌গা নদীর উপরে কর্তৃত্ব স্থাপন করতে না

পারলে ককেশাসের তেল করায়ত্ত হতে পারে না; এ জন্যেই ষ্ট্যালিনগ্রাডকে ধ্বংস করা দরকার। এ ছাড়া, ষ্ট্যালিনগ্রাডে ছিল ট্যাংক তৈরীর বিরাট কারখানা। ভল্‌গা নদীর আরও গুরুত্ব ছিল। এ যে শুধু ককেশাস থেকে মধ্য রুশিয়ায় সরবরাহ প্রেরণের একমাত্র জল পথ, তা নয়—এর উপরকার অসংখ্য পুলের মারফৎ ষ্ট্যালিনগ্রাড ও অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে ভল্‌গার পূর্ব তীরের সংযোগ রক্ষিত হয়। সুতরাং পূর্বে ভল্‌গা এবং পশ্চিমে ডন নদীর উপরে কর্তৃত্ব স্থাপন করতে হ'লে সামরিক গুরুত্ববিশিষ্ট ষ্ট্যালিনগ্রাড অধিকার করা একান্ত আবশ্যক। এই সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হয়ে হিটলার ফন বকের নেতৃত্বে তিন লক্ষ সৈন্য ও হাজার হাজার ট্যাংক, এরোপ্লেন ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম পাঠিয়ে দিলেন।

ফন বক এই বিরাট যান্ত্রিক বাহিনী নিয়ে সহরটিকে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে ঘিরে ফেললেন। এ ভাবে তিন দিকে অবরুদ্ধ ষ্ট্যালিনগ্রাডের খোলা রইল মাত্র পূব দিক। ভল্‌গা এখানে ষ্ট্যালিনগ্রাডকে পশ্চিমে রেখে দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কাস্পিয়ান সাগরে মিলিত হয়েছে। প্রত্যহ রাতে এই নদীর পূবতীর থেকেই যাবতীয় প্রয়োজনীয় সমরসম্ভার ষ্ট্যালিনগ্রাডে সরবরাহ হত।

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে এই অবরোধ সুরু হয়। নাৎসী হাই কম্যাণ্ড শহরটিকে দখল করার জন্য যে পরিমাণ সমরসম্ভার ও সৈন্য নিযুক্ত করল, তাতে শহরটি বেশীদিন প্রতিরোধ করতে পারবে বলে কেউই আশা করে নি ; এমন কি, মিত্রপক্ষও নয় ; নাৎসী বোমারু বিমান প্রত্যহ হাজার হাজার টন বোমা বর্ষণ করে ষ্ট্যালিনগ্রাডকে একেবারে সমতলভূমিতে পরিণত করে দিল বটে, কিন্তু দেখা গেল—সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেও প্রতিরোধী নাগরিকের অগ্নিনালিকা ও হাত বোমা শত্রুর গতি ব্যাহত করে দিচ্ছে। নাৎসী বাহিনীও দমবার পাত্র নয়—তারা শত শত ট্যাংক সামনে রেখে ক্রমেই শহরের দিকে এগিয়ে চলল এবং কিছুদিনের মধ্যে ঢুকেও পড়ল। উৎসুক জগদ্‌বাসী একটি মাত্র নিশ্চিত ঘটনার জন্যই তৈরী হয়ে রইল—যেকোন সময়েই ষ্ট্যালিনগ্রাডের পতন ; কিন্তু তা হ'ল কি ? নাৎসী নায়কেরাও হতভম্ব হয়ে গেলেন।

কী করে এই প্রতিরোধ সম্ভব হ'ল ? বস্তুত, যুদ্ধের প্রচলিত নিয়মকানুন অনুযায়ী ষ্ট্যালিনগ্রাডের পতন দু'এক ঘণ্টার ব্যাপার মাত্র। কিন্তু দু'এক ঘণ্টা করে চব্বিশ ঘণ্টা—এভাবে দিন, সপ্তাহ, মাসও কেটে গেল—অথচ সম্ভাব্য সম্ভব হচ্ছে না! নাৎসী-নায়কেরা দেখলেন, তারা শহরে ঢুকেছেন বটে, কিন্তু কিছুই দখল করতে

পারছেন না—একটা দালান অধিকার করছেন তো পরমুহূর্তেই তা বে-দখল হয়ে যাচ্ছে ; শুধু তাই নয়—প্রতিটি রাস্তায়, প্রতিটি গলিতে, দালানের প্রত্যেকটি কক্ষে ও কোণে শিকারী বাঘের মত লালফৌজ ও নাগরিক বাহিনীর লোক ওৎ পেতে আছে। বোমা বর্ষণের ফলে রাস্তায় অসংখ্য গর্ত হয়েছিল—সেখানে লুকিয়ে থেকেও তারা শত্রুকে ঘায়েল করতে ছাড়ছে না। এভাবে এক ইঞ্চি জমিও অজস্র ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও দখলে রাখা যাচ্ছে না। জার্মানীর ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ এই দুর্ভেদ্য দুর্গকে ধূলিসাৎ করার জন্যে আরও সৈন্য আরও সমর-সম্ভার আমদানী করলেন। সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছাসের মত এই দুর্ধর্ষবাহিনী ষ্ট্যালিনগ্রাডের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল—কিন্তু তাতেও অবস্থার এতটুকু উন্নতি হ'ল না।

সাধারণ নরনারী শহরের রাস্তায় রাস্তায় আত্মরক্ষা সমিতি গঠন করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো। মেয়েরা আহতদের শুশ্রূষা করে ও যুদ্ধরত সৈন্যদের রসদ যুগিয়ে সাহস ও কর্তব্যের পরকাষ্ঠা দেখাতে লাগল। অক্ষম স্ত্রীলোক ও শিশুদের ভল্‌গার তীরস্থ গর্তের মধ্যে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে লালফৌজ ও সশস্ত্র নাগরিকগণ সমস্ত শহরটিকে একটি লৌহ-কঠিন দুর্গে পরিণত করল—অথচ এর ভৌগোলিক অবস্থান সহজ

প্রতিরোধের অনুকূল নয়। ভল্‌গা নদী এখানে প্রায় এক মাইল চওড়া। পূর্বতীর থেকে রসদপত্র ও সমরসম্ভার বোঝাই ষ্টীমার ও গাদাবোট অনায়াসে নাৎসী বোমারুর বোমায় বিনষ্ট হতে পারে —এ আশংকা পূরাপূরিই ছিল ; তবুও তারা অসাধ্য সাধন করে চলল শুধু দৃঢ় সংকল্পের জোরে। প্রাণ থাকা পর্যন্ত কিছুতেই তারা নাৎসীদস্যুকে এক তিল ভূমিও ছেড়ে দিবে না। বিপদ যেভাবেই আসুক না—তাকে তারা বরণ করে নিবেই—হাসি মুখে, কর্তব্যের জোর তাগিদে। প্রসিদ্ধ জার্মান রণবিশেষজ্ঞ জেনারেল ডিটমার এক বেতার বক্তৃতায় এই অত্যদ্ভুত প্রতিরোধের কথা বলতে গিয়ে বললেন—"জার্মানী একেবারে হক্‌চকিয়ে গিয়েছে"। জার্মানী অজস্র ক্ষতিস্বীকার করেও, আধুনিক সকলরকম অস্ত্র প্রয়োগ করেও ষ্ট্যালিনগ্রাডের অধিবাসীদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে পারল না। প্রত্যেকটি নাগরিক যেন এক একখানা ইস্পাতের দণ্ড—প্রত্যেকটি বাসগৃহ ও ফ্যাক্টরী যেন এক একটি দুর্গ। জার্মানী কখনও এরূপ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় নি। মাঝে যুদ্ধের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে উভয় পক্ষই যুদ্ধ করতে করতে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। জার্মান বোমারুগুলো তখন বোমা ফেলবারও সুযোগ পায় নি।

এভাবে সংগ্রাম করতে করতে প্রায় তিন মাস কেটে গেল। তখন অক্টোবরের শেষ। হিটলার সেপ্টেম্বরের শেষ দিকেই দেশ-

বাসীর নিকট ঘোষণা করেছিলেন যে, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই ষ্ট্যালিনগ্রাডের পতন হবে—কিন্তু তা হ'ল না। অক্টোবর কেটে গিয়ে এল নভেম্বর—এল হিটলারের বুকে বজ্রাঘাতের ঐতিহাসিক নভেম্বর। এই মাসেই রুশিয়ায় বিপ্লব হয়েছিল—জারতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়েছিল এবং ঠিক তার ২৫ বছর পরে এই নভেম্বরই এল আবার হিটলারের মৃত্যুবাণ ব'য়ে।

মার্শাল টিমোশেঙ্কোর নেতৃত্বে লালফৌজের একটি বাহিনী আগে থেকেই ষ্ট্যালিনগ্রাডের সাহায্যার্থে উত্তরদিক থেকে এগিয়ে আসছিল। এর উল্‌টো দিকে মধ্য ককেসাস থেকেও এক পাল্টা অভিযান সুরু হয় ১৯শে নভেম্বর। এর কয়েক দিন পরে ষ্ট্যালিন-গ্রাডেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। নাৎসীবাহিনী এভাবে চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে মূল ঘাঁটী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ২৯শে নভেম্বরের মধ্যেই লালফৌজের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'ল। এই পাল্টা অভিযানের ফলে লালফৌজ ৬৬ হাজার অফিসার ও সৈন্য, সকলরকম নমুনার ২ হাজার কামান, ৩,৯৩৫টি মেশিনগান, প্রায় ৫০ হাজার রাইফেল, ক্ষত ও অক্ষত ১৩৭৯ ট্যাঙ্ক, প্রায় ১০,৭০০ ঘোড়া এবং ১২২টি রসদ ও গোলাবারুদের গুদাম হস্তগত করে।

ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। শত্রু দুর্ধর্ষ হলেও জনসাধারণের সংহত শক্তির নিকট তা দাঁড়াতে পারে না—

আর অস্ত্রবলের চেয়ে মনোবলের স্থান নীচে নয়। তা না হলে রুশজনসাধারণ জার্মানীর বিরাট যান্ত্রিক বাহিনীর সঙ্গে যে ভাবে স্বল্প শক্তি ও সম্ভার নিয়ে প্রতিরোধ করেছিল, তা কখনও সম্ভব হ'তো না। ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধকে যুদ্ধের প্রদর্শনী (Exhibition of battle) বলা চলে ; কেন না—আদিম যুগ থেকে আধুনিক যুদ্ধ পর্যন্ত মানুষ যত রকম অস্ত্রের (এটম বোমা বাদে) ব্যবহার করে আসছে—ষ্ট্যালিনগ্রাডে তার প্রত্যেকটির প্রয়োগ হয়েছে—এমন কি হাতাহাতি ও ধ্বস্তাধ্বস্তি পর্যন্ত। অনন্যসাধারণ দৃঢ়সংকল্প, দুর্জয় সাহস ও অদ্ভুত দেশাত্মবোধ ছিল রুশিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র।





হিরোসীমা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা তোমরা এর মধ্যেই ভুলে যাও নি। আর কিছু না হোক—নীল পোষাকপরা এ আর পি, সিভিক গার্ড, সিভিক ডিফেন্সের লোক-জন, চৌরঙ্গী অঞ্চলের খাকী পোষাকপরা মার্কিন, নিগ্রো ও গোরা সৈন্যের অহরহ

আনাগোনা, বিদ্যুৎগতি সামরিক লরী, জিপ, ট্র্যাক, গড়ের মাঠের এরোপ্লেন, ট্যাংক আর ব্ল্যাক-আউটের রাত ও বিপদ-সংকে, সাইরেনের আওয়াজ প্রভৃতি এত অল্পদিনের মধ্যে মন থেকে মুছে যাবার নয়। আর এও বোধ হয় জানো যে, এত সব আয়োজন হয়েছিল কলকাতাকে জাপানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য।

আধুনিক যুদ্ধ সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী। যুদ্ধের অস্ত্রও এখন যেমন বিচিত্র ও বেপরোয়া, তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রও আর আগেকার মত নির্দিষ্ট নেই। এখন আকাশ, মাটি, জল সর্বত্রই যুদ্ধক্ষেত্র। আর তা ছাড়া এখন যুদ্ধরত কোন পক্ষই আগে খবর দিয়ে কুরুক্ষেত্রে কিংবা পানিপথের মত কোন মাঠে সমবেত হয় না এবং অফিস-টাইমের মতো ১০ টায় সুরু করে সন্ধ্যার আগে শিবিরে ফেরে না। এখন শত্রু কখন, কী ভাবে, কোথা থেকে এসে ঘাড়ের উপর পড়বে, তার কোন টাইম-টেবল্ (সময়-তালিকা) নেই। শত্রুর বিমান ও বোমা এখন কাউকেই রেহাই দেয় না, সে দোষীই হ'ক আর নির্দোষই হ'ক। সামরিক ঘাঁটি থেকে শান্তশিষ্ট নিরীহ নাগরিকের কুটির পর্যন্ত কিছুই এখন উড়ন্ত কেল্লার দৃষ্টি এড়ায় না। বাছ-বিচার করে এখন যুদ্ধ চলে না। আধুনিক যুদ্ধের কোন নির্দিষ্ট নীতি নেই। জয়লাভের জন্য যে কোন সময়, যে কোন অস্ত্র, যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনই এখন প্রধান নীতি।

'মারি অরি পারি যে কৌশলে'—ইহাই এখনকার নীতি। অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে এই অপূর্ব নীতি পালন করাই আধুনিক যুদ্ধের মর্ম কথা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রথমে জার্মানী এবং পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নীতিরই চরম পরিচয় দিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষ এখন অমিতশক্তির অধিকারী। এ শক্তি ধ্বংস ও সৃষ্টি উভয় দিকেই প্রযুক্ত হতে পারে বটে, কিন্তু ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ করার দিকেই যেন রাষ্ট্রনায়কদের বেশী ঝোঁক। একমাত্র ধ্বংসের দেবতারই পূজা চলছে জগৎ জুড়ে। আর পূজার একমাত্র মন্ত্র "যশোদেহি দ্বিষোজহি" (আমাদের শত্রু বধ কর, আমাদের যশস্বী কর)! তাই আবিষ্কৃত হচ্ছে নিত্যনতুন সাংঘাতিক মারণাস্ত্র পাইকারী ধ্বংসের আয়োজনকে সম্পূর্ণ করার জন্যে। যে মারণাস্ত্র এই আয়োজনকে আপাতত চরমে তুলেছে, তারই নাম আণবিক বোমা। এখন আর জীবনের কোন মূল্য নেই—একটি আণবিক বোমাই এখন সমস্ত যুগের মিলিত অস্ত্রশক্তিকে লজ্জা দিয়ে অস্ত্রের রাজ্যে একাধিপত্য করছে। এর কাছে সাধারণ বোমা তুবড়ি বাজি।

সেকালে ব্রহ্মাস্ত্রের শক্তি ঠিক কি ছিল, জানা নেই; কিন্তু এ যুগের ব্রহ্মাস্ত্র এটম বোমার পরিচয় আমরা পেয়েছি। ১৯৪৫

সালের ৬ই আগষ্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্তৃপক্ষ এই বোমা হিরোসীমার উপরে নিক্ষেপ করে। এর ন' দিন পরেই জাপান মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

প্রথম মহাযুদ্ধও শেষ হয়েছিল এরূপ নতুন এক অস্ত্রের আবিষ্কার দ্বারা। এর নাম ট্যাংক। যুদ্ধের শেষ দিকে বৃটিশ এই যন্ত্রদানবকে যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়ার কিছুদিন পরেই জার্মাণী আত্মসমর্পণ করে। এবারেও দেখা গেল, ট্যাংক, বিমান ও বোমা সমানে চালিয়েও যুদ্ধ শেষ করা যাচ্ছে না। শোনা গেল, হিটলার নাকি এমন সব মারণাস্ত্র আবিষ্কার করছে, যা দিয়ে সে মিত্রশক্তিকে এক দিনেই ঘায়েল করে দিবে। অবশ্য জার্মাণী তা কিছু কিছু করেও ছিল। চালকহীন বোমারু, রকেট বোমা প্রভৃতি আবিষ্কার করে জার্মাণী মিত্রশক্তিকে কম চমক দেয় নি। কিন্তু এগুলো তত অধিকতর মারাত্মক ছিল না। জার্মাণী মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কারের সাধনায় নিযুক্ত ছিল। বৃটিশ বিমানবাহিনী, গোয়েন্দা বিভাগের সংবাদ অনুযায়ী একটানা সাতমান ধরে এই গবেষণার গোপন ঘাঁটিগুলি ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করেও তার কোন সন্ধান পাচ্ছিল না। শেষে একদিন শোনা গেল, প্রোফেসর অটো হ্যান নামক জনৈক বৈজ্ঞানিককে মিত্রশক্তি চুরি করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছে। এই অটো হ্যানই এটম বোমার আবিষ্কারক;

অবশ্য যে প্রচণ্ড শক্তিকে এই ক্ষুদ্রকায় বোমার মধ্যে বন্দী করা হয়েছে, বহুদিন থেকেই তার রহস্য উপলব্ধি করার জন্য বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা চলছিল। এই শক্তির নাম আণবিক শক্তি।

যে শক্তি অণু (atom) অর্থাৎ মূল পদার্থের কণাগুলিকে (particles) একত্র সংগ্রথিত করে রাখে, সেই শক্তির ক্রিয়া-রহস্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কৌশল আয়ত্ত করার প্রথম ফলই আণবিক বোমা। এই বোমার শক্তির পরিমাণ হিসেব করে বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন যে, ২০ হাজার টন 'টি এন টি'র (মারাত্মক বিস্ফোরক) চেয়ে আণবিক বোমা বেশী শক্তিশালী। বৃটিশের গ্রাণ্ড শ্লাম বোমা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় ও মারাত্মক ছিল, কিন্তু এটমের ধ্বংসশক্তি (Blast Power) তার চেয়ে ২ হাজার গুণ বেশী। অথচ এর আকার অত্যন্ত ছোট—প্রায় রাজহাঁসের ডিমের মত। এতটুকু আকারের মধ্যে কী দুর্দান্ত শক্তি-দানবকে আবদ্ধ করা হয়েছে, তা ধারণা করা যায় না। একটা উপমা দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করা যাক্। বটের অতটুকু বীজের মধ্যে কি বিরাট মহীরুহের সম্ভাবনা সহসা উপলব্ধি করা যায়?

এটম বোমার আবিষ্কারের আগে যে সমস্ত বোমা ব্যবহৃত হ'ত, তাতে পদার্থবিজ্ঞানের বিশেষ কোন অবদান ছিল না; সেগুলো

প্রধানত রাসায়নিক দ্রব্য। কিন্তু এটম বোমা ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রির সমবেত শক্তির বিস্ময়কর দান। একে এক কথায়, ফিজিও-কেমিষ্ট্রি বলা যেতে পারে। এ শক্তি শুধু যে ধ্বংসের কাজেই পটু, তা নয়, বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন, এর দ্বারা গঠনাত্মক ক্ষেত্রেও বিপ্লব সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। কৃষি-বাণিজ্য-শিল্প-চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতি এ শক্তির সাহায্যে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। বৈজ্ঞানিকগণ এখন এই দিকেই তাঁদের প্রতিভা প্রয়োগ করতে চান কিন্তু রাষ্ট্রনায়কগণকে সেদিকে বিশেষ উৎসাহী বলে মনে হচ্ছে না। হিরোসীমা ও নাগাসাকির ধ্বংসলীলা তাঁদের বিবেক বুদ্ধিকে এখনও সচেতন করতে পারে নি। এই আণবিক শক্তিকে মানুষ-মারা যন্ত্রে পরিণত করতে বৈজ্ঞানিকগণের আপত্তি ছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করতে হবে, নৈলে সভ্যতা ধ্বংস পায়—এই অজুহাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্তৃপক্ষ আবিষ্কারকদের মতামত উপেক্ষা করে হিরোসীমার উপর প্রথম শক্তি পরীক্ষা করে। এখন দেখা যাক্, আণবিক বোমার ধ্বংস ক্ষমতা কতখানি।

বোমা বর্ষণের আগে হিরোসীমার লোকসংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষ। বোমা বর্ষণের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় মারা যায় ৬০ হাজার, আহত হয় বাকি প্রায় সকলে এবং সমস্ত সহরের ৯০ হাজার দালানের ৬৮ হাজার ধূলিসাৎ হয়ে যায়। শহরের মাঝখানে মাত্র

৫টি দালান অক্ষত ছিল বলা যায়। তাও সামান্য মেরামত করে কাজ চালাতে হয়েছিল। আর পরোক্ষভাবে এমন অনেক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, যা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে ভড়কে দিয়েছিল। সামান্য আহত কিংবা আহত হয়নি—এমন অনেকেরই দু'এক সপ্তাহ পরে অদ্ভুত অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল। কারও দেখা গেল রক্তাল্পতা, কারও মাথার চুল উঠে যেতে লাগল—কেউ আবার মাথাধরা, পেটে অসুখ, জ্বর প্রভৃতিতে ভুগতে সুরু করল—অনেকের রক্ত চলাচলে গোলমাল সুরু হ'ল। এ ভাবে অনেকে মারাত্মক ব্যাধির আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে মারা গেল। যাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী ছিল, তারা বেঁচে গেল।

বোমাটি যেখানে পড়েছিল, সেখান থেকে চারিদিকে এক মাইলের মধ্যে যা কিছু ছিল, প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে যায়—এর বাইরের এলাকাও বিপর্যয় থেকে রেহাই পায় নি। এই বোমা বিদীর্ণ হওয়ার আগে প্রথমে আকাশে একটা আলো জ্বলে ওঠে। এই আলো অনেকটা ফটো তোলার সময়কার আলোর মত—একটা "noiseless flash" এর পরেই ফেটে গিয়ে এমন ধোঁয়া উদ্‌গিরণ করে যে, সে ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা ঠিক একটা ব্যাঙের ছাতার রূপ নেয় এবং এ 'ছাতাটা' মাইলখানেক পর্যন্ত উঁচু হয়; এর ফলে

আক্রান্ত এলাকায় যেন রাতের অন্ধকার নেমে আসে, অতি কাছে থেকেও লক্ষ্যবস্তু নজর করা যায় না।

এই অদ্ভুত মারাত্মক অস্ত্রের প্রয়োগে সমস্ত বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়েছিল। নিরীহ নাগরিকের আত্মরক্ষার সমস্ত উপায়কে ব্যর্থ করে এই বোমা হিরোসীমায় যে শ্মশান সৃষ্টি করেছিল—সেই শ্মশানই সভ্যতাগর্বী (?) মানুষের মহাশ্মশানের সূচনা কি না, কে জানে! কারণ তৃতীয় মহাযুদ্ধের কথাও শোনা যাচ্ছে। যারা যুদ্ধ চায়, তারা প্রথমে কানাঘুষার মারফতেই যুদ্ধ-মনোভাব তৈরী করার চেষ্টা করে। যুদ্ধ অনিবার্য—এরূপ একটা ভাব সৃষ্টি করতে পারলেই যুদ্ধ বাধাতে অসুবিধা হয় না। বর্তমানে রুশিয়া ও আমেরিকাই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। এদের মধ্যে যুদ্ধ নাকি একেবারেই অবশ্যম্ভাবী। আণবিক শক্তির নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি নিয়ে উভয়ের মধ্যে কোন মিটমাটই হয় নি। জাতিপুঞ্জের দরবারে এ নিয়ে অনেক গবেষণা, অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু মদ-গর্বী মার্কিণ ও রুশিয়া শান্তির পথে মীমাংসায় পৌছুতে রাজী নয়। রুশিয়া নাকি আণবিক শক্তির চেয়ে শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণা করছে। এই রশ্মিকে গবেষণাগারের আয়ত্তাধীন করতে পারলে গোটা পৃথিবীটাই হয় তো একটা মহাশ্মশানে পরিণত হবে —আন্তর্জাতিক অবস্থা ক্রমশই যেন এই ইঙ্গিত স্পষ্ট ক'রে তুলছে।

